ভগবৎ দর্শন

৪১ বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ মধুসূদন ৫৩১ ■ এপ্রিল ২০১৭

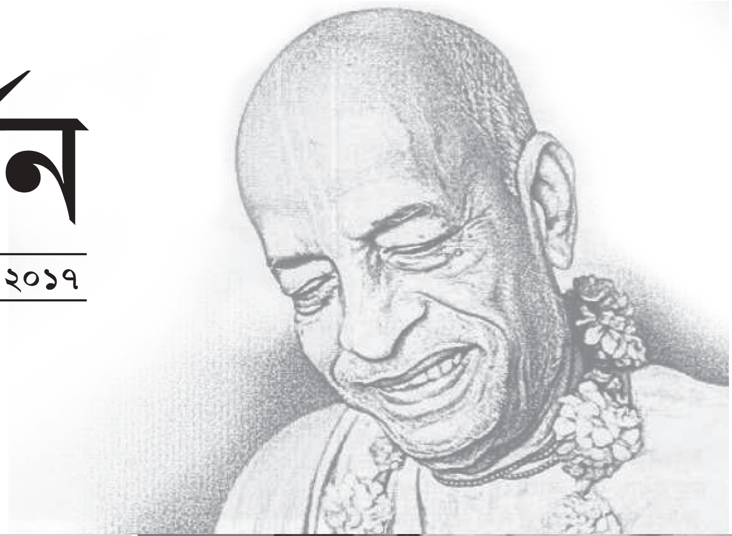

বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ

কি ভাবে রামরাজ্য স্থাপন হবে?	৪
ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁর ভক্তরা পরম প্রেমের উদাহরণ স্বরূপ	৭
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং	৯
শ্রীরাম চরিত্র	১১
জটায়ু পরাজয়েও বিজয়ী	১৬
শুনহে রাম কাহিনী	২৩
শ্রীপাদ রামানুজাচার্য	২৭
পবিত্রতা ও আদর্শ জীবন	২৯

বিভাগ

প্রশ্ন উত্তর	৩
অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	১৩
ভক্তি কবিতা	১৪
ছোটদের আসর	১৯
উৎসব (অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য)	২০
ইসকন সমাচার	৩১

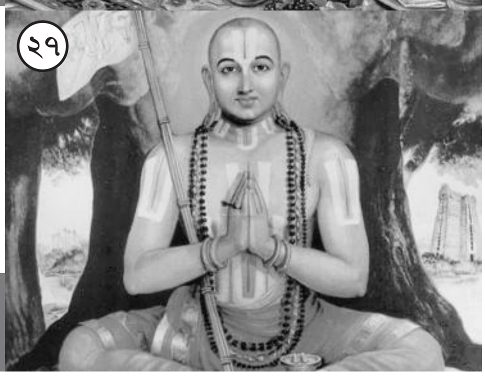

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

ভগবৎ দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশানুসারে)
আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুযোত্তম নিতাই দাস ● **প্রুফ সংশোধক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ● **প্রবন্ধক** এম সিং ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবন ধারা ● **হিসাব রক্ষক** সুশান্ত কুমার রায় ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **শ্রী অমল পুরাণ দাস ব্রহ্মচারী** দ্বারা প্রকাশিত
● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, ফোনঃ (০৩৩) ২২৮৯-৬২৪৭,২২৮৯-৬৪৪৬, মোবাইলঃ ৮৬২১০০৭৮১৩,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ভগবৎ দর্শন **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ১০০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ৪৫০ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ৯০০ টাকা ●সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ২২৫ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ৪০০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ১৫০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ৬৭৫ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ১৩০০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য (১ মাস অন্তর)- ২৮০ টাকা, ১ বছরের জন্য (প্রতি মাসে) - ৪২০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(কুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য ভগবৎ দর্শন - ২৫০ টাকা, ১ বছরের জন্য সংকীর্তন সমাচার - ২০০ টাকা, ১ বছরের জন্য দুটি - ৩০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গ্রাহক ভিক্ষা - ৪৯০ টাকা ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান।**

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা পাঠক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক পাঠক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩
২০১৭ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর রামরাজত্ব

প্রসঙ্গক্রমে কেউ কেউ রামরাজত্ব কথাটি ব্যবহার করেন। নয় লক্ষ বছর আগে ত্রেতাযুগ ছিল। সূর্যবংশের মহান রাজাগণ রাজত্ব করতেন। ভগবান রামচন্দ্র ওই বংশে আবির্ভূত হন। রামচন্দ্রের রাজত্বে বলা হয়েছে যে, মানুষ সর্বত্র স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারত। গুন্ডা, বদমাস, মাতাল, পকেটমার, বাটপাড়, নেশাখোর প্রভৃতিদের দৌরাত্ম্য ছিল না। সাত্ত্বিকভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরাই অধিক। সেই জন্য প্রীতি সৌহার্দ্যভাব মানুষদের মধ্যে বিরাজ করত। মেয়ে-পুরুষেরা পরিচ্ছন্ন নানাবিধ বেশভূষা পরিধান করতেন। অনেক রকমের গয়না ব্যবহার করতেন। না ছিল অপরের সম্পত্তি দখলের মনোভাব, না ছিল পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে মারামারি, খুনাখুনি। না ছিল মানসিক দুশ্চিন্তা উদ্বেগ।

এখন কলিযুগ। মানুষ নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক পীড়ায় অবসন্ন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কলিযুগ। হরিনাম কীর্তনের যুগ। মানুষের আয়ুষ্কালও অনেক কম। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আমাদের শাশ্বত অস্তিত্ব বলে মনে করে আমরা যদি আমাদের গৃহ, ভূমি, পরিবার, সম্পত্তি ইত্যাদির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের মিথ্যা কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য পরস্পর পরস্পরের সাথে সংগ্রাম করতে শুরু করি, যেহেতু এভাবেই সমাজের অধিকাংশ লোক অভ্যস্ত, তা হলে রাম, আরাম কিছুই পাওয়া যাবে না। হারামি আর ব্যারামিতেই অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর দুর্দশাময় চক্র থেকে মুক্তির উপায় থাকবে না। নিত্য সুন্দর জীবনের জন্য হৃদয় শোধনের খুবই প্রয়োজন। হৃদয় মার্জনের জন্য চিন্ময় শব্দ তরঙ্গ নামসংকীর্তনে সামিল হতে হবে —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

প্রশ্ন ১। রামচন্দ্রের রাজ্য-অভিষেক উৎসবে কেন মহারাজ দশরথ অন্য সকল রাজপুত্রকে অযোধ্যাপুরীতে আনালেন না?

—রসামৃতা রাধা দেবী দাসী, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীরা রাজা দশরথকে জানিয়েছিলেন, দশরথের জন্ম নক্ষত্র এখন রাহু দ্বারা আক্রান্ত। উল্কাপাত ইত্যাদি দুর্লক্ষণ রাজার জীবনহানির আশঙ্কা অবগত করাচ্ছে। রাজা দশরথও দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমাতে পারেন না। দশরথের মনে তীব্র ইচ্ছা জাগল তাঁর সর্বগুণান্বিত পুত্র রামচন্দ্রের অতি দ্রুত রাজ্যাভিষেক হোক। মাত্র দুই দিন পরেই চৈত্র মাসে চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করবে, সেই শুভদিনে রামের রাজ্য-অভিষেক উপযুক্ত বলে নির্দেশ দিলেন বশিষ্ঠ ও বামদেব ঋষি। দ্রুত অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছিল।

রামচন্দ্রকে পিতা দশরথ বললেন, রাম, তুমি কালই অভিষিক্ত হও। তোমার কনিষ্ঠ ভরত যদিও ধর্মাত্মা, যদিও তোমারই অনুগত, তবুও তার অবর্তমানেই তোমার অভিষেক হওয়া উচিত। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মানুষদের চিত্ত সর্বদা সমান থাকে না। ধর্মাত্মা সাধুদেরও চিত্ত রাগ-বিদ্বেষে আক্রান্ত হয়। আর, তাদেরকে ডেকে আনার মতো সময়ও বেশী নেই। পরে তাদেরকে প্রবোধ দেওয়া যাবে।

প্রশ্ন ২। ভগবান রামচন্দ্র সবারই প্রিয় ছিলেন। তবুও কেন তিনি ভাই ভরতকে আনালেন না, রাজাও হলেন না, পরন্তু বনবাস অঙ্গীকার করলেন?

উত্তর ঃ ভগবানের ক্রিয়াকলাপ দিব্য। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্। ভগবান এই জগতে যোগমায়া সমাবৃত হয়ে লীলা বিলাস করেন বলে সাধারণ মানুষ তাঁর ক্রিয়াকলাপ বুঝতে পারে না। তবে ভগবানের কৃপায় ভগবানের কার্য কেউ কেউ উপলব্ধি করে থাকেন। ভগবানের মায়াশক্তি ভগবানের ইচ্ছানুরূপ কার্য সংঘটন করে থাকেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভালো করেই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা কেউ রাজা হই, আর না হই, সেটা বড় কথা নয়, বিচার্য বিষয় হচ্ছে আমাদের স্থিতিটা পরিবারের মধ্যে বা প্রজাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ? না কি, হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ?

ভরত ও রামের মধ্যে চির প্রীতির সম্বন্ধ। তবুও রামচন্দ্র চাইছিলেন এখন ভরত রাজা হোক। আমার পঞ্চাশ-যাট হাজার ভক্ত—মুনিঋষিরা রাক্ষসদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে, তাদের এই জীবনে আমাকে দর্শন করবার বাসনা রয়েছে। তাই আমি এখন রাজসিংহাসনে বসবো না। আমি সেই বনবাসী দুঃখী মুনিঋষিদের দর্শন দেবো তাদেরই মতো জটাজুট রেখে, বানপ্রস্থী বসন পরিহিত হয়ে, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে নিয়ে। উৎপীড়নকারী রাক্ষসদের বধ করা এবং সাধু মহাত্মাদের আনন্দ দেওয়াই আমার এখন কাজ। অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন তারা সম্প্রতি কেবল আমার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন। তাই অবিলম্বেই আমার বনে যাওয়া কর্তব্য।

অযোধ্যার রাজসিংহাসনে পরে উপবেশন করা যাবে। অযোধ্যাপুরীর সকল ব্যক্তির মহিমা বৃদ্ধি হোক বিরহের মধ্যে। আমার প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা বিরহের মধ্যে প্রমাণিত হবে। মা কৈকেয়ী আমাকে বেশী ভালোবাসে। কিন্তু দাসী মন্থরা অতটা ভালোবাসে না। তাই তার কূটবুদ্ধি কুযুক্তিকে দেবী সরস্বতী আরও জোরালো করে তুলুক। মা কৈকেয়ী আমাকে বেশী ভালোবাসলেও অসৎসঙ্গ প্রভাবে আমাকে তাড়ানোর চেষ্টা করুক। এখন ভরত-শত্রুঘ্নকে ডাকার দরকার নেই। কারণ এখন রাজা না হয়ে আমাকে বনবাস করার লীলা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

আপনার ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী বিনিময় করুন।
আপনার জীবনের মহত্বপূর্ণ দর্শনচিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভুতি সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
আপনার লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ও চিঠি আমাদের ই-মেল করুন

ভগবৎ দর্শনের জন্য লিখুন

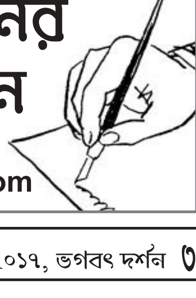

btgbengali@gmail.com

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, ২৭ মার্চ, ১৯৬৯

কি ভাবে রামরাজ্য স্থাপন হবে?

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

ভগবান রামচন্দ্র এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন একজন আদর্শ রাজার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এবং শিক্ষা দিতে। একজন রাজার কেমন হওয়া উচিত? দৃষ্টান্তটি হচ্ছে 'রাম রাজ্য', 'রাম রাজ্য'। এটি ভগবান রামচন্দ্রের রাজ্য। কারণ এখানে প্রত্যেকেই সুখী, প্রত্যেকেই, ভগবান রামচন্দ্রের জীবনে অনেক লীলা আছে।

একজন ভগবান রামচন্দ্রের কাছে এসেছিলেন। কারণ সেইসময় এখনকার মতো আদালত ছিল না যে, সে আদালতে গিয়ে ফি সমেত আবেদন করবে। তারপর ছয় বৎসর পরে রায় দেওয়া হবে। এটা সেরকম ছিল না। কারোর কোন অভিযোগ থাকলে রাজা রাম সভায় বসে তা শুনতেন এবং নাগরিকদের রাজার কাছে যেতে দেওয়া হতো এবং তারা সেখানে অভিযোগ উপস্থাপনা করতো। কারণ প্রকৃতপক্ষে তখন কোন অভিযোগ ছিল না। প্রত্যেকেই সুখে ছিল। অভিযোগগুলি খুবই ক্ষুদ্র ছিল। সুতরাং একজন রামচন্দ্রের কাছে এসে অভিযোগ করল, 'হে রাজন্, আমার পুত্র মারা গেছে। কি করে এমন হতে পারে? পিতার বর্তমানে কেমন করে তার পুত্র মারা যেতে পারে? আপনার শাসনে কি কোথাও কোন ত্রুটি আছে?' শুধুমাত্র দেখুন, অভিযোগটি হলো 'কেন আমার পুত্র আমার পুর্বে মারা গেল? এটি অস্বাভাবিক।' সুতরাং সেই সময় কোন কিছুই অস্বাভাবিক ঘটতো না। রাজা এমনকি তীব্র শীত, তীব্র প্রদাহের জন্য দায়ী থাকতেন। শ্রীমদ্ভাগবতমে এটি কথিত আছে। সুতরাং রাজারা কতখানি দায়িত্বশীল ছিলেন। তাঁরা সর্বদাই নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভাবতেন এবং নাগরিকরাও অত্যন্ত ভাল ছিলেন।

এক নাগরিক ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ এর সমক্ষে এসে বললেন যে, 'ইনি একজন ব্রাহ্মণ। যখন

আপনি প্রায় একপক্ষকাল অথবা এক মাসের জন্য ভ্রমণকালীন অনুপস্থিত ছিলেন, এই ব্রাহ্মণ আপনার অনুপস্থিতিকালে এক বিন্দু জলও পান করেন নি।' কেন? 'কারণ ইনি আপনার দর্শনের জন্য এখানে আসেন।' ঠিক যেমন আমরা মন্দিরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহ দর্শনের জন্য যাই। অর্থাৎ ভগবান রামচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তিনি (ব্রাহ্মণ) আসতেন। রামচন্দ্রকে দর্শন করে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে তারপর তিনি গৃহে যেতেন এবং প্রাতরাশ হিসাবে কিছু পেতেন। এই ছিল তার সংকল্প। ভগবান রামচন্দ্র একপক্ষকাল বা একমাস ধরে রাজকার্যে বাইরে থাকার জন্য তিনি যেহেতু তাঁর দর্শন পান নি তাই কোন খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করেন নি। শুধু দেখুন, নাগরিকরাও রাজা সদৃশ ছিলেন। অর্থাৎ সেই সময়ে সেখানে রামচন্দ্রের একটি মূর্তি ছিল যা মহারাজা ইক্ষ্বাকুর সময় থেকে সেই পরিবারে পূজিত হতো। মহারাজা ইক্ষ্বাকু ছিলেন মনুর পুত্র যিনি রামচন্দ্রের পরিবারের পূর্বপুরুষও ছিলেন। সুতরাং তিনি ছিলেন ভগবান রামচন্দ্রের ভক্ত এবং ভগবান রামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহকে তিনি পূজা করতেন। সুতরাং পুরুষানুক্রমে সেই বিগ্রহ পরিবারে পূজিত হয়ে আসছিল। কিন্তু যখন রামচন্দ্র স্বয়ং বর্তমান ছিলেন তিনি সেই বিগ্রহটিকে ঘরের দেরাজে বন্ধ করে রেখেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ যখন শ্রীরামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হলেন তখন শ্রীলক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট ঐ ব্রাহ্মণের দৃঢ় সংকল্পের কথা নিবেদন করলেন এবং তখন শ্রীরামচন্দ্র নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর মূর্তিটি যেন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় যাতে তাঁর অবর্তমানে সেই ব্রাহ্মণ ঐ বিগ্রহে পূজা নিবেদন করে তার সংকল্পে অটুট থাকতে পারে। সেই রূপ আমি বলতে চাইছি যে, সেই বিগ্রহ অথবা শ্রীরামচন্দ্রের অর্চা বিগ্রহ আজও দক্ষিণ ভারতে বর্তমান রয়েছেন। সেই সময় থেকে সেই বিগ্রহ পূজিত হয়ে আসছে।

সুতরাং জনসাধারণ রামরাজ্যের কাঠামোর প্রতি আগ্রহশীল ছিল। এমনকি আজও কখনো কখনো রাজনীতিবিদরা রামরাজ্য নামে দল গঠন করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই। কখনো কখনো বলা হয় যে, জনগণ ভগবান ব্যতীত ভগবানের রাজ্য চান। এই প্রকার উচ্চাশা কখনো পূর্ণ হয় না। সুশাসন কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন নাগরিক এবং শাসকের মধ্যে সম্পর্ক ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁর নাগরিক সম্পর্কের সদৃশ হয়।

ভগবান রামচন্দ্র তাঁর রাজ্য শাসন করতেন এমনভাবে যেন একজন পিতা তার সন্তানের প্রতি যত্নশীল হয় এবং নাগরিকরাও ভগবান রামচন্দ্রের সুশাসনের প্রতি কর্তব্যপরায়ন ছিলেন। তাঁরা রামচন্দ্রকে তাঁদের পিতার মতো দেখতেন।

রামরাজ্য কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন নাগরিক এবং শাসকের মধ্যে সম্পর্ক ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁর নাগরিক সম্পর্কের সদৃশ হবে।

এই রূপে শাসক এবং নাগরিকের সম্পর্ক একজন পিতা এবং পুত্রের সম্পর্কের মতো হওয়া উচিত। যখন একটি পরিবারের সন্তানেরা সুশিক্ষিত হয় তখন তারা তার পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হয়। যখন একজন পিতা সুশিক্ষিত হন তখন তিনি তাঁর সন্তানদের সঠিক যত্ন নিতে পারেন। সুশাসকের অর্থ হলো যে, শাসককে অত্যন্ত সজাগ হতে হবে যেন নাগরিকরা তাদের কর্তব্য সঠিক ভাবে সম্পাদন করে। এটিই হলো প্রথম কর্তব্য। তাদের সর্বতোভাবে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। যেমন একজন পিতা তার সন্তানদের সুরক্ষাও দেন আবার একই সঙ্গে কঠোরভাবে শাসনও করেন যাতে

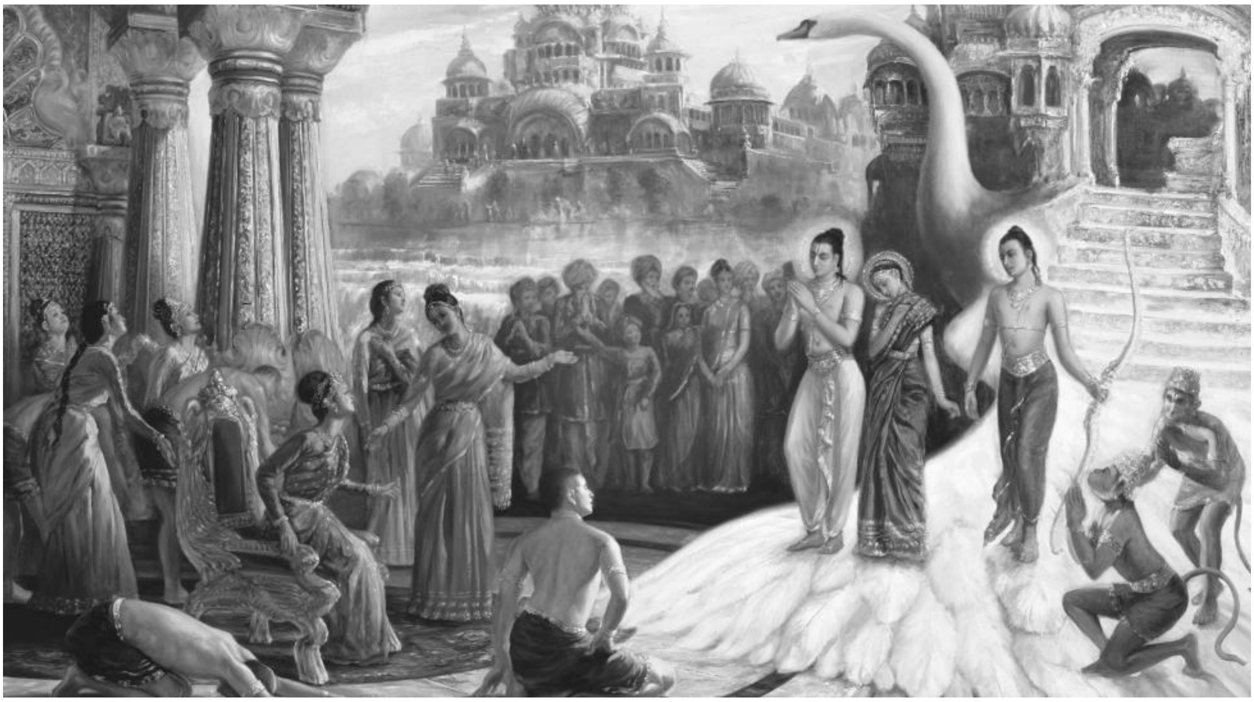

তারা নীতিগত ভাবে এবং সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। এই হলো পিতার কর্তব্য। এই হলো শাসকের কাজ। যদি পিতা ভাবেন যে, 'আমার সন্তান উৎসন্নে গেলেও আমি পরোয়া করি না। আমি তাদের খেতে দিই। সেটাই যথেষ্ট।' এটা কি পিতার কর্তব্য? না। পিতার কর্তব্য হলো সন্তানের জন্য অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং একই সঙ্গে দেখা যাতে তারা অর্বাচীন না হয়ে সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠে। সেটাই হলো পিতার কর্তব্য। অনুরূপভাবে বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখি শাসকেরও একই কর্তব্য। অন্যথায় শাসকের কি প্রয়োজন?

সুতরাং এই ছিল রামচন্দ্রের পরিচালনা। তিনি, তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং তাঁর পত্নী বনে গমন করেন। তাঁর পত্নীকে দস্যু রাবণ চতুরতার সঙ্গে অপহরণ করে এবং শ্রীরাম এবং রাবণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। জড়জাগতিকভাবে রাবণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে সৈন্যদল নিয়ে যাননি। না। তিনি প্রত্যাবর্তন করেননি, কারণ তিনি বনবাসের নির্দেশ পেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি বন্য জন্তু, বানরদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করেন। তিনি আসুরিক জড়বাদী রাবণের সঙ্গে বানরদের নিয়ে যুদ্ধ করেন। আপনারা চিত্র দেখেছেন। তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত সেতু নির্মাণ করেন। শ্রীলঙ্কাকে রাবণের রাজ্য বলা হয়। সেটি এমন সেতু ছিল যার পাথরগুলি জলে ভাসছিল।

সুতরাং আমরা যদি ভগবান রামচন্দ্রের জীবন, কার্যপ্রণালী এবং লীলা সমূহ শ্রবণ করি তার অর্থ এই যে, আমরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে আছি। তাঁর রূপ, তাঁর নাম, তাঁর লীলা সমূহ এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি হলেন পরমেশ্বর। সেইরূপ আপনি শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র নাম জপই করুন অথবা তাঁর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করুন অথবা তাঁর লীলাসমূহ, অপ্রাকৃত লীলাসমূহ কীর্তন করুন, সর্ব অবস্থাতেই আপনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন। সুতরাং আমরা রামনবমীর মতো ভগবানের অবতারের আবির্ভাব এবং লীলা সম্বরণের তিথিগুলির সুযোগ গ্রহণ করি যার মাধ্যমে আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রয়াসী হই। তাঁর সান্নিধ্যে আমরা পরিশুদ্ধ হয়ে উঠি।

আপনি কি ভগবৎ দর্শন পাচ্ছেন না?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

(033) 2289 6446
8621007813

btgbengali@gmail.com

ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁর ভক্তরা

পরম প্রেমের উদাহরণ স্বরূপ

শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ

আজ সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই উৎসবমুখর দিনটি পালন করছে। কিন্তু অধিকাংশ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের মতোই অনেকেই জানে না কেন? এটি কলিযুগের ধর্ম যেমন কি অতি পবিত্র বস্তুও খুব সাধারণ ভাবে পরিগণিত বা অনুভূত হয়। প্রায়শই সমস্ত ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ ভক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অপেক্ষা সামাজিক মনোরঞ্জন বা বিনোদন হিসাবেই পালন করা হয়, কিন্তু প্রতিটি বৃহৎ ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎভক্তি বৃদ্ধির উপায় অথবা প্রচেষ্টা করা। শ্রীমদ্ভাগবতম্ এ কথিত আছে 'শ্রম এব হি কেবলম্।' পেশা যাই হোক, আধ্যাত্মিক কর্ম যা করা হয় তা যদি পরিশেষে আমাদের চেতনাকে গভীরভাবে এটি শোনার জন্য, জপ করার জন্য এবং ভগবানের প্রতি সেবা ও ভক্তি করার জন্য রুচি জাগ্রত না হয় তাহলে আমরা লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হব। আমরা আমাদের সময় নষ্ট করব।

রাবণের প্রতি ভগবান রামচন্দ্রের প্রেম

ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার জন্য স্মরণীয়। যদি কোন ব্যক্তির একটি কঠিন প্রাণঘাতী রোগ থাকে এবং কোন শল্য চিকিৎসক সেই ব্যক্তির দেহ কেটে তাকে সেই কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্ত করে তাহলে সেটি কি অপরাধ, না প্রকৃতপক্ষে জীবন দান? সেইরূপ যখন পরমেশ্বর ভগবান কারোর জন্য কিছু করেন তা প্রত্যেকের সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্যই। রাবণকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। রামচন্দ্র তার অজ্ঞান, ভ্রম, অহংকার ইত্যাদিকে বধ করেছিলেন এবং এইভাবেই তিনি সমগ্র বিশ্বের নিরপরাধ মানুষদেরকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বকে তাদের জীবন সুরক্ষিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করেছিলেন।

ভগবান তাঁর ভক্তদের স্বীকৃতি দেন এবং ভক্তরা ভগবানকে স্বীকৃতি দেন

রাবণ সমগ্র জগতকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল এবং সে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে হরণ করেছিল। কিন্তু যে আশ্চর্যজনক ভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে মুক্তি প্রদান করেছিলেন সেটি খুবই শিক্ষণীয় এবং ভক্তদের প্রতি ভগবানের হৃদয়ের প্রেমকে উন্মোচিত করেছিল। কারণ প্রতি পদক্ষেপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর নিজের থেকেও ভক্তদের অধিক স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং যখনই তিনি কিছু করেছেন সেটি এমন ভাবে করেছেন যেন সেটি ভক্তদের আশির্বাদেই সম্পন্ন হয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। কারণ এই জগতে আমাদের মধ্যে এক গভীর আসক্তি আছে যা আমরা করেছি বা যা আমরা করিনি সেই সব কিছুর স্বীকৃতি নেওয়া এবং কোন ত্রুটির জন্য অপরকে দোষারোপ করা — এটি হলো অহঙ্কার। মিথ্যা অহংকারে মোহাচ্ছন্ন আত্মা মনে করে সে সব কার্যের কর্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জড় প্রকৃতিতে সব কর্মই প্রকৃতির তিনটি জড় গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সর্বোপরি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং আমরা স্বীকৃতি পেতে এবং অন্যকে দোষারোপ করতে আগ্রহী। কিন্তু ভগবান যখন এই জগতে অবতীর্ণ হন, তিনি শুদ্ধ চিত্ত ভক্তদেরকে স্বীকৃতি প্রদানে বিশেষ ভাবে আগ্রহী থাকেন। যখন শ্রীরামচন্দ্র সীতার অন্বেষণ করছিলেন, তিনি

ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমান সম্বন্ধে সম্যক ভাবে অবগত ছিলেন। তিনি প্রতিটি অণুতে অবস্থান করেন, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করেন এবং এমন কিছুই নেই যার সম্বন্ধে তিনি অবগত নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করছেন কোথায় সীতা? তিনি যখন কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে গেলেন তখন সেখানে সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান এবং জাম্বুবানের সহিত সন্ধি করেন সীতাকে উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য। সত্যই কি তাঁর আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল? প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বানররাই দেখতে, শুনতে, চিন্তা করতে এবং জীবন ধারণ করতে পারত শুধুমাত্র তাদের অন্তরাত্মার ভগবৎ শক্তির প্রভাবে। তিনিই তাদেরকে সমস্ত শক্তি প্রদান করেছেন আবার তিনিই তাদেরকে বলছেন, 'আমি তোমাদের সাহায্য চাই।' তারপর সমস্ত বানর সেনা চতুর্দিকে অন্বেষণ করা শুরু করল এবং শ্রীরামচন্দ্র শুধু অপেক্ষা করতে লাগলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সঠিক দিগনির্ণয় করে। হনুমানজী এক প্রকান্ড লাফে ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রায় ৮০০ মাইল অতিক্রম করে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছালেন। তার সেবা সমাপ্ত করে পুনরায় এক লাফে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি সীতামাতাকে সন্দেশ দিলেন। তিনি রাবণের অতি প্রিয় অশোক কানন ধ্বংস করেছিলেন এবং তারপর তিনি রাবণের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারপর তিনি লঙ্কা নগরীর একটি বড় অংশ দহন করেছিলেন। তারপর আবার এক লাফে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

সেবাই হলো প্রকৃত প্রেম। একে অপরকে সন্তুষ্ট করাই হলো আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত প্রেম।

শ্রীরামচন্দ্র আনন্দাশ্রু পূর্ণ নয়নে তাকে প্রেমালিঙ্গন করেন। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বললেন, তুমি যা করেছ তার জন্য আমি চিরঋণী হয়ে থাকব এবং হনুমানজী একশ শতাংশ নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি যা করেছেন তা শুধুমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা এবং শক্তির প্রভাবে। এই হলো প্রেম, এই হলো আধ্যাত্মিক জগতে প্রেমের আদান প্রদান। ভগবান তার ভক্তদের স্বীকৃতি দেন এবং ভক্তরা নিজেদের জন্য কোন স্বীকৃতি গ্রহণ না করে ভগবানকেই সমস্ত স্বীকৃতি প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ — আধুনিক হনুমান

শ্রীল প্রভুপাদ জীবিত অথবা মৃত যে কোন অবস্থাতেই, ভগবান শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ পালন করতে জলদূত জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। এই ছিল তার সেবা ভাব। হনুমান যেমন সীতামাতাকে উদ্ধার করতে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন তেমনই শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের হৃদয়ের ভক্তিরূপী সীতামাতা যা কিনা লোভ, ঈর্ষা, ক্রোধ, গর্ব এবং ভ্রম রূপী রাবণ দ্বারা অশোক কাননে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তাকে উদ্ধার করার জন্য সাগর পার করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে উদ্ধার করে, আমাদের আত্মাকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হনুমান পূর্ণ দীনতার সঙ্গে ভাবতেন, 'হে প্রভু, আমার হৃদয়ে অবস্থান করে তুমি আমাকে যা করাও আমি তাই করি' এবং শ্রীল প্রভুপাদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছেন, 'আমি তোমার হাতের পুতুল। তুমি আমাকে যেমন ভাবে নাচাও আমি তেমনি নাচি।' হনুমানও নিজেকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতের পুতুল বলে মনে করতেন। একজন শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, যখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে, 'পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম' তাহলে তাঁরা স্বয়ং এটি করলেন না কেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেছেন কেন তিনি এটি করলেন না? শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, তাঁরা এটি অনায়াসেই করতে পারতেন কিন্তু তাঁরা চেয়েছিলেন এই সেবাটি আমরা করি। এই হলো ভগবৎ প্রেম। সেবাই হলো প্রকৃত প্রেম। একে অপরকে সন্তুষ্ট করাই হলো আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত প্রেম।

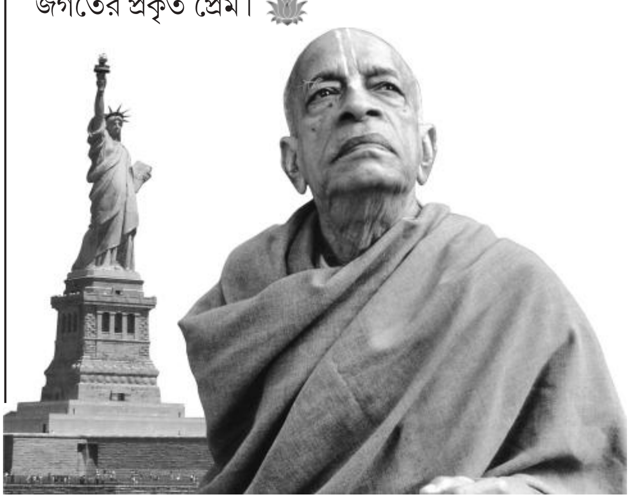

শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন সন্ন্যাসী শিষ্য এবং বর্তমানে ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার। তিনি নিয়মিত রূপে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তির সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশাদারদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্গদর্শন প্রদান করেন।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

ভগবদগীতার ৯ম অধ্যায়ের ২ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখম্ কর্তুমব্যয়ম্।।

'এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।'

বিদ্যার রাজা হচ্ছে ভক্তি বিদ্যা। ভগবান ভক্তিকে লুকিয়ে রাখেন। তাই এটি পরম গুহ্য তত্ত্ব। গোপনীয় তত্ত্ব সমূহের মধ্যেও রাজা। এই ভক্তিতত্ত্ব সবচেয়ে বেশী পবিত্র এবং সবচেয়ে বেশী বাস্তবানুগ (Most Practical)। অত্যন্ত সুখে সম্পাদন করা যায় এবং এটি মৃত্যুর দ্বারা নষ্ট হয় না বলে অমৃত এবং অব্যয়। কোনও কিছুই একে নষ্ট করতে পারে না।

এই প্রবন্ধে আমরা আজ বিশেষ করে এই শ্লোকের 'প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং' কথাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। অনেক সময় মানুষকে বলতে শোনা যায়, 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে' 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই'। অধিকাংশ মানুষই প্রত্যক্ষ প্রেমী। প্রত্যক্ষ মানে সরাসরি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বাস্তবানুগ — ব্যবহারিক।

প্রকৃত ভক্তি অত্যন্ত ব্যবহারিক। যে কোনও বিজ্ঞানের শাখায় তাত্ত্বিক (Theoretical) এবং প্রায়োগিক (Practical) — দুটি দিক থাকে। বই পড়ে জানলাম, কস্তুরী খুব সুগন্ধিযুক্ত। কস্তুরী সম্বন্ধে এই জ্ঞান হচ্ছে তাত্ত্বিক। নকল কস্তুরীর গন্ধ গ্রহণ করাটা প্রায়োগিক বটে, কিন্তু ভ্রম উৎপাদনকারী। খাঁটি কস্তুরীর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারলে তা হবে সত্যিকারের প্রায়োগিক জ্ঞান। শোনা যায়, রসুনের রসের মধ্যে এক বিন্দু কস্তুরী নিক্ষেপ করলে রসুনের গন্ধ আর পাওয়া যাবে না। শুধু কস্তুরীর গন্ধই বলবৎ থাকবে।

ভক্তিকেও সেভাবে বুঝতে হবে। কস্তুরী যেমন নকল বা আসল সম্ভব, ভক্তিও তেমনি নকল এবং আসল ভেদে দুপ্রকার। নকলেরও আবার রকমফের আছে। কর্ম মিশ্রা, জ্ঞান মিশ্রা, যোগমিশ্রা — ইত্যাদি নানা প্রকার নকল ভক্তি আছে। অনেকে বলেন, বহু বছর ধরে ভক্তি করলাম কোনও উন্নত রস কিন্তু পেলাম না। এখনও যৌন জীবনকেই উন্নত রস বলে মনে হয়। শ্রীবিগ্রহ থেকে সুন্দরী যুবতীর রূপই

অধিক মনোহর বলে মনে হয়। অর্থাৎ মন মাতানো কস্তুরীর গন্ধ পাচ্ছি না, শুধু রসুনের গন্ধই পাচ্ছি এবং সেটিই ভাল লাগছে। আসল ভক্তিকে আর ধরতে পারছি না, শুধু নকল ভক্তি নিয়ে টানা হেঁচড়া করছি।

এই সমস্যা থেকে বাঁচতে হলে কী করে 'প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং' তথা আসল ভক্তির রসকে ব্যবহারিক ভাবে উপলব্ধি করা যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।।
(গীতা ২/৫৯)

নিরাহারী ব্যক্তি মানেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি। এখানে কৃষ্ণ বলছেন, 'নিরাহারস্য দেহিনঃ' অর্থাৎ 'উপবাসী দেহধারী ব্যক্তির'। তার দশা কেমন? শোনা যায়, একবার একটি এরোপ্লেন

সাধুসঙ্গে হরিনামই তথা নববিধা ভক্তির অনুশীলনই উদ্ধারের একমাত্র প্রত্যক্ষ পথ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে এক দুর্গম পাহাড়ে বরফের মধ্যে পড়ে যায়। অধিকাংশ আরোহী মরে গিয়েছিল। শুধু দু একজন বেঁচে ছিল। উদ্ধারকারী একটি হেলিকপ্টার প্রায় একমাস পরে প্লেনটিকে খুঁজে পায়। সেখানে যে দুজন মানুষ জীবিত ছিল, তারা শুধু মৃত আরোহীদের পচা মাংস খাচ্ছিল। তারা ছিল প্রকৃত নিরাহারী। মানুষের পচা মাংস তাদের খাদ্য নয়। তবে নিরাহারী অবস্থায় তা খাদ্য বলে গ্রাহ্য হতে পারে। তাই মানুষ যতদিন কৃষ্ণপ্রেমের আহার থেকে বঞ্চিত থাকবে, ততদিন তার কাছে জঘন্য যৌন জীবনকে আস্বাদনীয় বলে মনে হবে। কিন্তু 'পরম দৃষ্ট্বা নিবর্ততে' অর্থাৎ উন্নত এবং পরম আহার দেখলে বা আস্বাদন করলে মানুষ আর মায়ার পচা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হবে না।

সেই নিরাহার থেকে বাঁচার উপায় কি? উপরের দৃষ্টান্তে আমরা দেখি হেলিকপ্টারে করে উদ্ধারকারীরা এসেছিল। আমাদের উদ্ধারকারী হচ্ছেন শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর প্রকৃত অনুগামীগণ।

কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পচা মাংস খেতে খেতে ঐসব নিরাহারীদের মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে, তারা বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। তাহলে তারা কিন্তু ঐসব উদ্ধারকারীদের গায়ে আঘাত করবে। অনাদিকাল ধরে মায়ার পচা রস আস্বাদন করতে করতে অধিকাংশ নরপশুদের দশা এখন এই রকম। তাহলে উপায়?

উপায় হচ্ছে প্রেম। মহপ্রভু এই প্রেমের মালা গেঁথেছেন হরিনামের সঙ্গে। 'নাম-প্রেম-মালা গাঁথি, পরাইলা সংসারে।' জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুকে কলসীর কানা দিয়ে আঘাত করেছিল। কিন্তু গৌর এবং নিতাই তাদেরকে প্রেম দান করেছিলেন।

প্রেমই হচ্ছে সেই উন্নত রস। কৃষ্ণপ্রেমের সেই উন্নত রস আমরা ভুলে গেছি। অনন্ত কোটি বিশ্বসুন্দরী বা স্বর্গীয় অপ্সরাদের সঙ্গসুখ সেই কৃষ্ণপ্রেমের কাছে পচা মাংসের মতো দুর্গন্ধযুক্ত। কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে অত্যন্ত সুসুখম্।

কৃষ্ণকেই অনুভব করতে পারছি না, তো কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম হবে কী করে? যারা সত্যিকারের কৃষ্ণপ্রেমী তাদের বলা হয় সাধু। এই সব প্রকৃত সাধুদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব করতে হবে।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেসু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।

উত্তম প্রেম লাভ করা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে কঠিন বটে। তবে মধ্যম প্রেম খুব কঠিন নয়। ঈশ্বরে বা কৃষ্ণে প্রেম চাই। নববিধা ভক্তি — শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে ঈশ্বরে প্রেম হবে। কৃষ্ণাধীন বৈষ্ণবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এই প্রেম এবং বন্ধুত্বের অভাব হলেই মানুষের পতন হবে। এছাড়া সর্বত্র কৃষ্ণের মহিমা প্রচার করতে হবে (কৃপা)।

এই বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করার জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ ছয়টি সূত্র প্রদান করলেন ঃ

● **দদাতি** — শুদ্ধ বৈষ্ণবকে দান করুন। ● **প্রতিগৃহ্ণাতি** — শুদ্ধ বৈষ্ণবের দেওয়া প্রেম-উপহার গ্রহণ করুন। ● **গুহ্যম্ আখ্যাতি** — শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গে ভক্তি রহস্য বিনিময় করুন। ● **পৃচ্ছতি** — কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন। ● **ভুঙক্তে** — শুদ্ধ ভক্তদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করুন। ● **ভোজয়তে** — শুদ্ধ ভক্তদের প্রসাদ ভোজন করান।

এই হচ্ছে প্রত্যক্ষ ভক্তি। প্রত্যক্ষ কৃষ্ণপ্রেম। মানুষ যতদিন এই কৃষ্ণপ্রেমের আহার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিরাহারী থাকবে, ততদিন সে মায়ার পচা সুখ আস্বাদন করবে। আস্বাদন করতে করতে বদ্ধ পাগল হবে। কস্তুরীর গন্ধ ছেড়ে রসুনের দিকে ধাবিত হবে। শ্রীবিগ্রহ ছেড়ে গলগ্রহের ফাঁসীকে নিমন্ত্রণ করবে।

নিষ্ঠাবান ভক্তরা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের সঙ্গে সুগভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করে মায়ার সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। সাধুসঙ্গে হরিনামই তথা নববিধা ভক্তির অনুশীলনই উদ্ধারের একমাত্র প্রত্যক্ষ পথ।

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস দীর্ঘ ৩১ বৎসর যাবৎ ইসকনের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত আছেন। তিনি বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পি. এইচ. ডি. করেছেন। প্রথম দিকে তিনি বিবিটি'র সেবায় যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মায়াপুর ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ।

শ্রীরাম চরিত্র

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাব বা চরিত্র কত সুন্দর ছিল তা রামায়ণ মহাকাব্যে অযোধ্যাকান্ডে প্রথম সর্গে বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীতে তাঁর উপমার স্থান ছিল না। ভূমাবনুপমঃ।

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন সর্বদা প্রশান্ত চিত্ত। হৈ হুল্লোড়, চেঁচামেচি, হৈ চৈ, তর্ক বিবাদ তিনি পছন্দ করেন না। সর্বদা বিনীতভাবে কথা বলতেন। এমনকি, কেউ তাঁকে পরুষ বাক্য, কটুকথা বললেও, তিনি তার প্রত্যুত্তর দিতেন না।

এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের মধ্যে থাকলে রামচন্দ্রের আশীর্বাদ পাওয়া যেত।

তিনি এমন বিশুদ্ধাত্মা ছিলেন যে, কেউ যদি কখনও তাঁর সামান্য কিছু উপকার করত, তাতেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হতেন। আবার, কেউ যদি তাঁর শত শত অপকার করত, তাতেও তিনি সেই কথা মনে করতেন না।

আমরা উপকারীর উপকারের কথা মনে রাখি না, বরং কেউ যদি সামান্য কিছু অপকার করে তার কথা সারাজীবন মনে রাখি। আমাদের বন্ধুত্ব ভাবের তুলনায় শত্রুভাবই প্রবল।

শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকালে গুরুকুলে অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন। তখন বহু পরিশ্রমের শিক্ষা কালেও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি, সৎ সরল স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত শিষ্টালাপ করতেন।

সম্প্রতি একটি খবর শুনেছি, পিতার কাছে বন্দুকে গুলি চালানো শিখতে গিয়ে বালক পুত্রটি মেজাজ গরম করে পিতাকেই গুলিবিদ্ধ করল।

শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রিয়বাদী ছিলেন। তিনি আগেই মধুর বাক্যে অন্যকে সম্ভাষণ করতেন। তিনি অন্যের মন বুঝে কথা বলতেন। এমন কথা বলতেন যাতে কেউ মনে কষ্ট না পায়। তিনি কাউকে এমনভাবে সম্বোধন করে কথা বলতেন যে, যে কেউই মনে করতে পারে এই রাম আমারই।

শ্রীরামচন্দ্র অতিশয় বীর্যবান ছিলেন, মহাবীর, শক্তিশালী। কিন্তু তিনি কখনও গর্বিত ছিলেন না।

সমাজে বলবানের সর্বদা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করার প্রবণতা দেখা যায়। কেউ যদি দেহগত বা ধন-সম্পদগত কারণে বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে যায় তাহলে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

শ্রীরামচন্দ্র অতীব বিদ্বান ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

শ্রীরামচন্দ্র বৃদ্ধদের সম্মান করতেন। বৃদ্ধরা রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করতেন। তাঁর বিজয় কামনা করতেন।

বৃদ্ধদের তো সম্মান করতেন, সমস্ত প্রজাদেরকেও তিনি ভালবাসতেন। এমনকি পশু পাখীদেরকেও। সকল প্রজাও তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিল।

শ্রীরামচন্দ্র অতিশয় বীর্যবান ছিলেন, মহাবীর, শক্তিশালী। কিন্তু তিনি কখনও গর্বিত ছিলেন না।

রামচন্দ্র কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। সাধারণত লোক সমাজে আমরা দোষগুলিকে চাপা দেওয়ার জন্য মিথ্যা বলার ব্যবস্থা করি, কিন্তু দোষ না থাকলে আর তাকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার কোনও প্রয়োজন নেই।

শ্রীরামচন্দ্র সকলেরই প্রতি দয়া করতেন। বিশেষ করে দীন দরিদ্রদের প্রতি বেশী দয়াবান ছিলেন। দরিদ্রদের প্রতি যে বেশী দয়ালু তার মধ্যে একটা সুন্দর মহানুভব গুণ ফুটে ওঠে।

শ্রীরামচন্দ্র জিতেন্দ্রিয় ও অতি ধার্মিক ছিলেন। তিনি সর্বদা শুচি থাকতেন। দেহ ও মন সর্বদা শুদ্ধ। তিনি সাধু মহাত্মাদের বিশেষ মান্য করতেন।

তিনি নিজের কুলোচিত মতি অবলম্বন করে ক্ষত্রিয় ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বোধ করতেন। কি করে প্রজাদেরকে পালন করা যায় এবং সমাজের মধ্যে উৎপাত সৃষ্টিকারীদের দমন করা যায়, সেই সব চিন্তা করতেন।

তিনি কখনও শাস্ত্র নিষিদ্ধ অমঙ্গল কার্য করতেন না। এমনকি শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথাও শ্রবণ করতেন না।

তাঁর অপরিমিত স্মৃতিশক্তি, লৌকিক ব্যবহার দক্ষতা, অলসভাব রহিত স্বভাব ছিল।

অনেক মন্ত্রী গুপ্তচর তাঁর সহায় ছিল। তিনি কখনও দুর্বাক্য বলতেন না। তিনি সময়মতো প্রজাদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ, পোষ্যদের প্রতিপালন, দুষ্টদের দমন করতেন। অর্থ উপার্জনের সমস্ত উপায় এবং শাস্ত্রানুসারে অর্থ ব্যয় করবার ব্যাপারে তিনি অভিজ্ঞ।

তিনি মাৎসর্যহীন, সমস্ত ব্যক্তিরই প্রিয় ভাজন। আবার তিনি ছিলেন ধনুর্যজ্ঞে পারদর্শী অতিরথ। একাই একসাথে দশ হাজার সেনার সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ হলে তাকে মহারথ বলা হয়। আরও অধিক সেনার সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ হলে তাকে অতিরথ বলা হয়। তিনি সেনা পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন। বিভৎস শত্রুর অভিমুখে গিয়ে তাকে প্রহার করতেও পটু।

মহারাজ দশরথ চিন্তা করলেন আমার পুত্র রামচন্দ্র পৃথিবীর মতো ক্ষমা, বৃহস্পতির মতো বুদ্ধি, ইন্দ্রের মতো বীর্য সমন্বিত। তার অতুলনীয় নানাবিধ গুণ রয়েছে। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। তাই এখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখলে আমি আনন্দ পাব। সমস্ত প্রজা রামকে অধিক ভালোবাসে।

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্

JAGRATA CHHATRA SAMAJ

দৈনন্দিন কাজকর্ম, পড়াশুনায় যুক্ত থেকেও ছাত্রজীবনে নৈতিক শিক্ষা, চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধন করে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

Are you a student?
Learn Basics of.....
* ***Personality Development***
* ***Character Building***
* ***Secret of Success & much more............***

Join with Enlightened Student group.

Contact:
SAFE
চৈতন্য ভবন, ISKCON, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ
ফোন: (03472) 245-498, e-mail: abd@pamho.net

জপ করুন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।।

আনন্দিত থাকুন

মটরশুঁটির পিজা

উপকরণ ঃ

মটরশুঁটি ৫০০ গ্রাম। আলু বড় সাইজের ২টি। ক্যাপসিকাম ১টি। লবণ ও হলুদ পরিমাণ মতো। আদা ৫০ গ্রাম। লংকা ৬টি। ময়দা ৫০০ গ্রাম। তেল ৫০০ গ্রাম। চিনি ১ টেবিল চামচ। টম্যাটো ২টি। ধনেপাতা সামান্য।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

প্রথমে ময়দা একটা পাত্রে নিয়ে তাতে লবণ ও তেল অল্প দিয়ে একটু মেখে নিন। তাতে জল দিয়ে আটা যেভাবে মাখা হয় সেভাবে মেখে নিয়ে আধা ঘন্টা মতো রেখে দিতে হবে।

তারপর মটরশুঁটির খোসা ছাড়িয়ে দিয়ে ভাপিয়ে নিন। আলু সেদ্ধ করে নিন। আদা ও লংকা কুচিয়ে নিন। ক্যাপসিকাম ছোট ছোট টুকরো করে নিন। সেদ্ধ আলু ভালো করে মেখে নিন। টম্যাটো ছোট ছোট টুকরো করে নিন।

এবারে উনানে কড়াই বসান। ২ চামচ তেল দিন। তেল গরম হলে আদাকুচি, লংকাকুচি দিয়ে খুনতিতে নেড়ে চেড়ে ক্যাপসিকামের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। লবণ ও হলুদ দিন। একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে পাঁচ মিনিট হালকা আঁচে রাখুন।

তারপর ঢাকনা খুলে টম্যাটো কুচি, ধনেপাতা কুচি, চিনি দিয়ে নেড়ে নিয়ে সেদ্ধ মাখা আলু দিন। এর সাথে ভাপানো মটরশুঁটিগুলো একটু চটকিয়ে দিয়ে দিন। ভালো করে নাড়াচাড়া করে তুলে নিন। পুর তৈরী হলো।

এবার মাখানো ময়দা একটু ঠেসে নিয়ে ছোট ছোট লেচি করে বেলে নিন। সবগুলো রুটি বেলা হয়ে যাবে। তারপর একটা রুটির ওপরে একটু পুর দিয়ে, তার ওপরে আর একটা রুটি চাপিয়ে দিয়ে চারপাশ অর্থাৎ রুটির প্রান্তগুলি ভালো করে টিপে টিপে বন্ধ করে দিন। এইভাবে দুই রুটির মধ্যে পুর থাকবে। যতগুলি হয় বানিয়ে ফেলুন।

কড়াইতে তেল গরম করুন। গরম তেলে রুটিগুলি ভেজে নিন।

কোনও সুস্বাদু সস যোগে এই গরম গরম পিজা শ্রীশ্রীনিতাইগৌরকে ভোগ নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

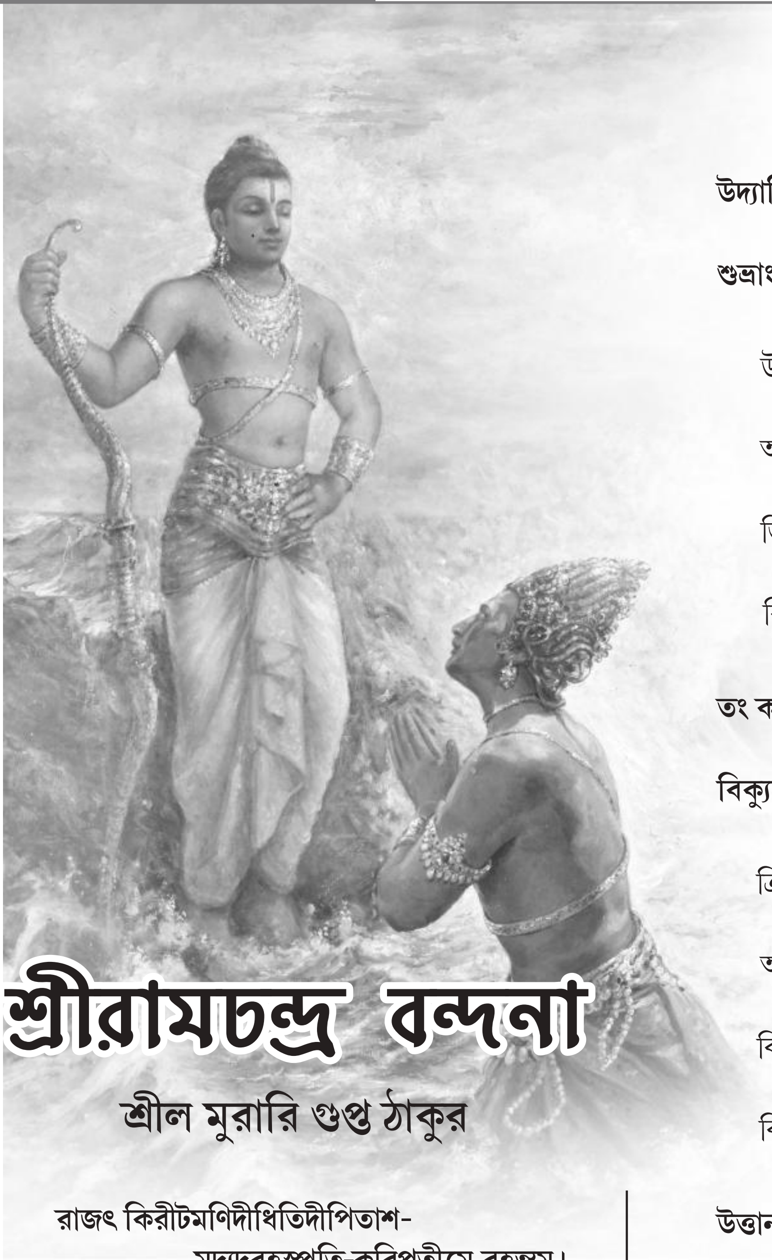

শ্রীরামচন্দ্র বন্দনা

শ্রীল মুরারি গুপ্ত ঠাকুর

রাজৎ কিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশ-
মুদ্যদ্বৃহস্পতি-কবিপ্রতীমে বহন্তম্।
দ্বে কুন্ডলেহঙ্করহিতেন্দু সমান বক্তং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।।

মুকুট কিরণে উজল চৌদিগ
আকাশেতে সমুদিত।
গুরু-শুক্র সম কুন্ডল তাঁর
দুই কানে পরিহিত।।
নিষ্কল চন্দ্র বদন মন্ডল
অপরূপ শোভাকারী।
বিশ্ববন্দিত শ্রীরামচন্দ্র
সতত বন্দনা করি।।

উদ্যাদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্।
শুভ্রাংশুরশ্মি-পরিনির্জিত-চারুহাসং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।।

উদিত তপন কিরণে কশিত
নয়নপদ্ম যাঁর।
অতি সুন্দর বিম্ব অধর
নাসিকা সুচারু যাঁর।।
জিনি চাঁদ ছটা মধুর হাস্য
রঘুকুলবর হরি।
বিশ্ব বন্দিত শ্রীরামচন্দ্র
সতত বন্দনা করি।।

তং কম্বুকন্ঠমজমম্বুজতুল্যরূপং
মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্।
বিক্যুদ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।।

ত্রিরেখ কন্ঠ সুনীল পদ্ম
শরীর কান্তি যাঁর।
অঙ্গে শোভিত দীপিত কনক
মুকুতা অলঙ্কার।।
বিজুলী বলাকা যেন মেঘবুকে
দেখায় চমৎকারী।
বিশ্ববন্দিত শ্রীরামচন্দ্র
সতত বন্দনা করি।।

উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং
পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ।
কুর্বন্ত্যসিতকনকদ্যুতির্যস্য সীতা
পার্শ্বেহস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি।।

এক পদ্ম আনি পাঁচশ দল করি
কনক-লাবনী সীতা।
অঙ্গুলিতে ধরি যাঁর পাশে আসি
হাসিমুখে অবস্থিতা।।
সেই সুন্দর রঘুনন্দন
জানকীবল্লভ হরি।
বিশ্ববন্দিত শ্রীরামচন্দ্র
সতত বন্দনা করি।।

অগ্রে ধনুর্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরণভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যমধামবরলক্ষ্মণনামা যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সতত ভজামি।।

যাঁর সম্মুখে শেষ নামে সেই
লক্ষ্মণ ধনুর্ধর।
অপরিমেয় মহা তেজোময়
সুবর্ণ কলেবর।।
যাঁহার সেবায় নিয়োজিত সদা
মহাবিক্রমধারী।
বিশ্ববন্দিত শ্রীরামচন্দ্র
সতত বন্দনা করি।।

যো রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধু-সুধাংশুরূপো
মারীচ-রাক্ষস-সুবাহু-মুখান্নিতহত্য।
যজ্ঞং ররক্ষ কুনিকান্বয়-পুণ্যরাশিং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।।

রঘুবংশের সাগরেতে যিনি
উত্থিত সুধাধার।
মারীচ রাক্ষস সুবাহু আদিরে
করে যিনি সংহার।।
বিশ্বামিত্রের পূত যজ্ঞস্থলী
যিনি সুরক্ষাকারী।
বিশ্ববন্দিত শ্রীরামচন্দ্র
সতত বন্দনা করি।।

হত্বাং খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধম্
শ্রীদন্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শক্রম্
তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি।।

স-গণ খর ত্রিশির কবন্ধ
বহু রাক্ষস হত।
বালিরে বধিয়া সুগ্রীবে মিত্রতা
করে দশরথসূত।।
দন্ডক বন- দূষণ মোচন
রাবণ-হত্যাকারী।
বিশ্ববন্দিত শ্রীরামচন্দ্র
সতত বন্দনা করি।।

ভংক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া
বৈবাহিকোৎসববিধিং পথে ভার্গবেন্দ্রম্।
জিত্বা পিতুর্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্যং
রামং জগত্রগুরুং সততং ভজামি।।

জনকপুরীতে হরধনু ভাঙি
গ্রহণ করিলা সীতা।
অযোধ্যা নগরে ফিরিবার কালে
পরশুরামে করে জিতা।।
পরম সুন্দর রঘুকুলবর
পিতার আমোদকারী।
বিশ্ববন্দিত শ্রীরামচন্দ্র
সতত বন্দনা করি।।

ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ
শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ।
বৈদ্যস্য মূর্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে
ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ।।

শ্রীরাম-অষ্টক শুনি শ্রীগৌরাঙ্গ
বৈদ্যের মস্তকে।
নিজ পাদপদ্ম অর্পণ করি
লিখিলেন ললাটে।।
'রামদাস' তুমি থাকহ মুরারি
আমারই প্রসাদে।
সেই রাম কিনা দেখ মোরে তুমি
পুরাও মনের সাধে।।

অনুবাদঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমায়াপুরে এই বন্দনা শুনে শ্রীগৌরচন্দ্র মুরারি গুপ্তের সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্র রূপে প্রকাশিত হলেন।

আপনি কি ভগবৎ দর্শন পাচ্ছেন না?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

(033) 2289 6446
8621007813

জটায়ু পরাজয়েও বিজয়ী

চৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী

কেউই পরাজয় পছন্দ করে না। যখন আমরা নিজেদেরকে হারতে দেখি তখন আমরা কোন শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গ করতে চেষ্টা করি বিজয়ী হওয়ার জন্য। যখন মানুষ ভগবানের পূজা করতে শুরু করে, তখন তারা মনে করে যে, ভগবান তাকে যুদ্ধে জয়লাভ করতে সাহায্য করবে। এবং এই পৃথিবীর বিভিন্ন শাস্ত্র সেইসব ঘটনার ব্যাখ্যা করেছে যে, ভক্তরা কিভাবে ভগবানের কৃপাতে সমস্ত কঠিন প্রতিকুলতাকে জয় করেছে।

তথাপি, এমনও শাস্ত্রীয় ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেখানে ভক্তরাও পরাজিত হয়েছে। কেমনভাবে সেই ব্যাখ্যাকে বুঝতে হবে? আমাদের ধারণাকে জড়জগতের উর্ধ্বে আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যেতে হবে।

এই সমস্ত ঘটনা আমাদেরকে স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, ভগবান প্রদত্ত সুরক্ষা কিভাবে আমাদের অস্তিত্বকে জড়বাস্তবের উর্ধ্বে গিয়েও সুরক্ষিত করে। যদি আমরা এই স্তরে মনে করি যে, ভগবান সর্বদাই সাফল্য প্রদান করবেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাসে ধাক্কা লাগতে পারে, এমনকি জড় জাগতিক ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। আরও গুরুত্বপুর্ণ এই যে, আমরা আধ্যাত্মিক জগতের অনেক মূল্যবান ভগবৎ কৃপা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করব।

মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও সংকল্পে অটুট

কিভাবে আধ্যাত্মিক দর্শন জড় জাগতিক ঘাত প্রতিঘাতের ধারণাকে বদলে দেয় এটা বোঝার জন্য আমাদের রামায়ণের শকুন জটায়ুর ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সে রাবণকে সীতামাতার অপহরণ থেকে বিরত করার জন্য কিভাবে আত্মবলিদান দিয়েছিল এটি সুবিদিত। সেই লোভী দানব সীতামাতার সুরক্ষাগুলিকে বিফল করে তাঁকে অপহরণ করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সে সীতামাতাকে আকাশ পথে তার পুস্পক বিমানে নিয়ে যাচ্ছিল, সীতামাতা উন্মত্তভাবে সাহায্যের জন্য চীৎকার করছিলেন। যদিও রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ অনেক দূরে থাকার জন্য শুনতে পাননি কিন্তু কেউ একজন শুনেছিল এবং সক্রিয় হয়েছিল।

সীতামাতা দেখলেন যে, জটায়ু একটি গাছ থেকে উড়ল। এই বৃদ্ধ পক্ষীটি মহারাজ দশরথের মিত্র ছিল। সীতামাতার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের সময় সে দন্ডক নামক অরণ্যে বাস করত। যখন রামচন্দ্র, সীতামাতা এবং লক্ষ্মণ সেখানে এসেছিলেন তখন জটায়ু তাঁদেরকে স্বাগতম্ করেন। সে তাদেরকে আশ্বস্তও করেছিল যে, এই দৈত্য দানব পূর্ণ অরণ্যে সে সীতামাতার সুরক্ষায় সাহায্য করবে। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে জটায়ু সীতামাতাকে উদ্ধার করার জন্য উড়তে শুরু করল।

একজন বীর যোদ্ধার স্ত্রী হওয়ার সুবাদে সীতামাতা বুঝতে পারলেন যে, এই বৃদ্ধ পক্ষীটি কোন ভাবেই ঐ যুবক এবং শক্তিশালী দৈত্যের সঙ্গে লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পারবে না। তাই তিনি তাকে চীৎকার করে বললেন যে, রামচন্দ্রকে তাঁর অপহরণের সংবাদ দিতে এবং সাবধানও করলেন এই আশঙ্কায় যে, এখানে হস্তক্ষেপ করলে রাবণ তাকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু জটায়ুর পক্ষে সীতামাতার এই সাবধান বাণী মানা অসম্ভব ছিল। সে ভাবল যে, সীতার অপহরণকে বন্ধ করার

জন্য যদি কিছু না করে তাহলে তার বেঁচে থেকে কি লাভ। দৃঢ় চিত্তে সে রাবণের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে তার এই একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোককে অপহরণের অনৈতিক কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগল। প্রত্যাশিত ভাবেই, এই নৈতিক কথোপকথন ঐ নীচ দানবকে নিবারিত করতে পারল না। জটায়ু তৎপরতার সঙ্গে কৌশল বদল করে রাবণকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করল।

সে রাবণের বাহুতে নখ দিয়ে বিদ্ধ করল, তার চুল তার চঞ্চু দিয়ে টেনে চার পাশে ঘোরাতে লাগল। রাবণ প্রচন্ড ক্রোধে চীৎকার করতে লাগল। এই ভেবে যে, একটা নগণ্য শকুন তাকে টানা হ্যাঁচড়া করছে, তাও আবার একজন স্ত্রীলোকের কাছে যাকে কিনা সে তার নতুন পাটরাণী করার জন্য প্রভাবিত করতে চাইছে।

রাবণ সত্ত্বর বুঝতে পারল যে, জটায়ু একজন সাধারণ শিকারী নয়। সে একজন শক্তিশালী যোদ্ধা। জটায়ুর পরিকল্পনা সে রাবণকে আক্রমণ করবে এবং হত্যা করবে। তাই সে বলপূর্বক রাবণের অশ্বচালিত রথকে লক্ষ্য করে ধ্বংস করার চেষ্টা করল। সে তার চঞ্চুর একটি আঘাতেই রথচারীকে ফেলে দিল এবং পুনঃ পুনঃ আঘাতে রথটিকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলল।

ইত্যবসরে রাবণ তার বৃহদাকার তীর ধনুক নিয়ে জটায়ুকে প্রত্যাঘাত করতে শুরু করল। যেহেতু তার রথটি খন্ড বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল তাই রাবণ মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়ে ছিল। মাটিতে থেকেই সেই ক্রুদ্ধ দানব জটায়ুর প্রতি এত শর নিক্ষেপ করেছিল যে, সেগুলি জটায়ুকে পক্ষীর বাসার মতো আচ্ছন্ন করে ছিল। যদিও জটায়ু আহত হয়েছিল কিন্তু আক্রমণ স্তিমিত করেনি।

কিছু শর উপেক্ষা করে কিছু শরকে সহ্য করে জটায়ু তার তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে রাবণকে আঘাত করতে লাগল এবং অত্যন্ত বিস্ময়কর ক্ষমতার দ্বারা সে রাবণের একটি হাত কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু তাকে নিরুৎসাহ করে আবার রাবণের হাত পুনঃ নির্মাণ হয়ে গেল। রাবণের প্রতি ব্রহ্মার বর ছিল যে, রাবণের শরীরের যে খন্ডই ছেদন হোক না কেন তা তৎক্ষণাৎ পুনর্গঠিত হবে। তাই জটায়ু যতবার রাবণের অঙ্গ খন্ড বিখন্ড করল তা তৎক্ষণাৎ আবার পুনর্গঠিত হয়ে গেল।

কিছু সময় পরে জটায়ু ক্রমে ক্লান্ত হতে লাগল এবং তার ক্ষিপ্রতা কমে আসতে লাগল। রাবণ এই অবস্থা অনুধাবন করতে পেরে যাতে ঐ পক্ষী তার কাছ থেকে পলায়ন করতে না পারে সে বিদ্যুৎ গতিতে তার তরবারির আঘাতে তার একটি ডানা কেটে ফেলল এবং মুহূর্তের মধ্যে অন্য ডানাটিও কেটে ফেলল। রক্তাক্ত অবস্থায় জটায়ু মাটিতে পতিত হল।

অসহায় অবস্থায় কান্না করতে করতে সীতা এই ভয়ানক যুদ্ধ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থাতেও জটায়ুর দিকে ধাবিত হলেন তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কিন্তু জয়োল্লাসে রাবণ তার চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে নিয়ে আসল এবং তার মায়াশক্তির দ্বারা আকাশ দিয়ে উড়ে গেল জটায়ুকে প্রচন্ড কষ্ট এবং যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দিয়ে।

জীবনের শেষ নিঃশ্বাস দিয়ে শেষ সেবা

যদিও জটায়ু মৃতবৎ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল তথাপি সে প্রাণবায়ু রক্ষা করেছিল। সীতামাতা তাকে তাঁর অপহরণের সংবাদ শ্রীরামচন্দ্রকে দিতে বলেছিল। তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও জটায়ু অপেক্ষা করেছিল এবং শ্রীরামচন্দ্রের নাম ধরে চিৎকার করছিল এবং ভগবানের পবিত্র নামজপের মাধ্যমে সান্ত্বনা খুঁজছিল।

ভক্তি জড়জাগতিক বিধ্বংসী পরাজয়কেও পারমার্থিক যুক্তির বিজয়ে রূপান্তরিত করে

এর মধ্যে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ পাগলের মতো সীতামাতার খোঁজ করছিলেন। কিছু সময়ের মধ্যে তিনি জঙ্গলে এলেন এই ভেবে যে, এটি কোন প্রাণঘাতী যুদ্ধের মল্লভূমি হবে। তিনি সম্মুখে কিছু একটি পড়ে থাকতে দেখলেন। রামচন্দ্র ভাবলেন এটি সীতা অপহরণকারী কোন পক্ষীরূপ মায়াবী দানব এবং তিনি তাঁর তীর ধনুক দিয়ে তাকে বধ করতে উদ্যত হলেন। জটায়ু এমন ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল যে, শ্রীরামচন্দ্র তাকে চিনতে পারে নি।

জটায়ুর কাছে এটি ভক্তি এবং বিশ্বাসের কত বড় পরীক্ষা ছিল কেন, যখন সে দেখল যে রামচন্দ্র তাঁর তীর তার দিকে লক্ষ্য করেছে তার প্রাণ নেওয়ার জন্য যে কিনা তার প্রাণ উৎসর্গ করেছে সীতামাতার প্রাণ রক্ষা করার জন্য! তবুও মনে প্রাণে বিশ্বাসের সহিত সে শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ করতে থাকল। রামচন্দ্র সেই মৃদু জপ শুনতে পেলেন। কৌতূহলবশতঃ তিনি তাঁর ধনুকটিকে নিচে রেখে সতর্কতার সহিত দেখতে লাগলেন, যখন তিনি পক্ষীটিকে জটায়ু বলে চিনতে পারলেন তখন সম্মুখ দিকে ধাবিত হলেন এবং তাকে আলিঙ্গন করলেন। জটায়ু তার শেষ জীবনীশক্তিটুকু দিয়ে যা ঘটেছিল

তা বর্ণনা করলেন এবং সীতামাতার অপহরণের সংবাদ রামচন্দ্রকে দেওয়ার শেষ সেবাটুকু করে চিরকালের জন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

গভীর শোকে রামচন্দ্র স্বয়ং জটায়ুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন — ভগবানের এই অভূতপূর্ব লীলা সমাজ সংস্কারকেও প্রতিষ্ঠা করল এবং জটায়ুর জীবন সর্বোত্তম সাফল্যের প্রতিষ্ঠা পেল।

জটায়ু পরাজয়েও বিজয়ী

আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাদেরকে এটা বুঝতে সাহায্য করে যে, আমরা হচ্ছি অবিনাশী আত্মা যা জন্ম থেকে জন্মান্তর ধরে নিত্য মুক্তির দিকে যাত্রা করে। আমরা প্রত্যেকেই পার্থিব অস্তিত্ব রক্ষায় মায়ার সঙ্গে লড়াই করছি যা আমাদেরকে সাময়িক সুখের প্রতি প্রলুব্ধ করে এবং নিত্য সুখ থেকে বঞ্চিত করে।

এই যুদ্ধে এটা অধিক গুরুত্বপুর্ণ ছিল যে, ভগবানকে স্মরণ করার সাফল্য অর্জন করতেই হবে কারণ কোন মতেই চিরকাল কেন, দীর্ঘকাল ধরেও মৃত্যুকে এড়ানো সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতা (৮/৫-৬) বলছেন মৃত্যুকালে যে যেভাবে স্মরণ করে তার পরবর্তী জীবনও সেই রকম হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ করলে তৎক্ষণাৎ ভগবৎধামে প্রবেশ করা যায়।

যদিও জটায়ু রাবণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল, তথাপি সে ভগবান রামচন্দ্রের পরম সান্নিধ্যে মৃত্যুলাভ করার পরম সুযোগ লাভে সফল হয়েছিল, এবং গভীরভাবে তাঁর স্মরণে অভিনিবিষ্ট হয়েছিল।

সে শকুন যোনিতেও এইরকম গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেছিল। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বৈদিক পরম্পরায় শকুনকে অজ্ঞানের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়, তারা শবদেহ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে যা নিকৃষ্টতম অশুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জটায়ু, শকুনদেহ হওয়া সত্ত্বেও রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে তার নশ্বরদেহ ত্যাগ করার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিল এবং তাঁর পরম আশ্রয়ও প্রাপ্ত হয়েছিল।

এখানেই জটায়ুর সৌভাগ্যের শেষ হয়নি। তার মৃত্যু হওয়ার পর, শ্রীরামচন্দ্র তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন এইভাবে যেমন ভাবে এক পুত্র তাঁর পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু সে পার্থিব মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। সে পরাজয়েও বিজয়ী হয়েছিল।

চৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী ভগবৎ দর্শনের ইংরেজী সংস্করণ 'ব্যাক টু গড হেড'-এর সম্পাদকীয় মন্ডলের সদস্য।

আমার প্রিয় ছোট্ট প্রভুরা,

শ্রীশ্রীগৌরনিতাই তোমাদের সুস্থ ও সুন্দর রাখুন। তোমাদের জন্য এই সংখ্যায় রয়েছে দশটি প্রশ্ন। প্রতি প্রশ্নের ডানদিকে বন্ধনীর মধ্যে দুই-তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তর লিখে পাঠালে তোমাদের নাম পরবর্তী ভগবৎ-দর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। তোমাদের পাঠানো চিঠিতে অবশ্যই তোমাদের নাম, ঠিকানা, বয়স ও কোন্ শ্রেণীতে পড়ো তা উল্লেখ করবে। কোন্ সংখ্যার উত্তর দিচ্ছ সেটিও লিখবে। যেমন এই সংখ্যার উত্তর লিখলে উল্লেখ করবে ঃ ছোটদের আসর ৪১/২ এপ্রিল ভগবৎ-দর্শন।

প্রশ্ন ঃ-

১) অশোক গাছের ফুল কি রঙের? (গাঢ় লাল / দুধের মতো সাদা / হালকা সবুজ)
২) শ্রীরামচন্দ্র পৃথিবীতে কত বছর রাজত্ব করেছিলেন? (১ লক্ষ / ১১ হাজার / ৬০ হাজার)
৩) অযোধ্যা কোন্ রাজ্যে অবস্থিত? (হরিয়ানা / রাজস্থান / উত্তরপ্রদেশ)
৪) লবণাসুরকে কে বধ করেন? (লক্ষ্মণ / ভরত / শত্রুঘ্ন)
৫) লক্ষ্ণৌ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? (রামচন্দ্র / লক্ষ্মণ / ভরত)
৬) হনুমানের মা-বাবা কে? (অদিতি-কশ্যপ / অঞ্জনা-পবনদেব)
৭) রামচন্দ্র চৌদ্দ বছর বনবাস মধ্যে সবচেয়ে বেশী সময় কোথায় বাস করেছিলেন? (চিত্রকূট / দন্ডকারণ্য / কিষ্কিন্ধ্যা)
৮) মিথিলাতে মাটির মধ্যে জনক রাজা শিশুকন্যা সীতাকে পেয়েছিলেন। সেই মিথিলা কোন্ রাজ্যে? (পশ্চিমবঙ্গ / বিহার / উড়িষ্যা)
৯) লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাক কেন কেটে ফেলেছিলেন? (সে রামকে বিবাহ করতে চাইছিল / সে সীতাদেবীকে মেরে ফেলতে চাইছিল)
১০) রামচন্দ্র ও তাঁর পার্ষদবর্গ কোন্ নদীতে অন্তর্ধান লীলা করেন? (মন্দাকিনী / গঙ্গা / সরযূ)

তোমরা যারা ৪০/১২ ভগবৎ-দর্শনের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর লিখে পাঠিয়েছো তাদের নাম দেওয়া হলো ঃ-

প্রিয়া দ্বারী (সেন হাট, হুগলী), শান্তকৃষ্ণ দাস (দিগপাড়, বাঁকুড়া), সৌমিকা মালিক (বাজেমেলিয়া, হুগলী), কৃষ্ণা, তৃষ্ণা, সঞ্চিতা, আস্তিক বর্মন (জানকীচক, পূর্বমেদিনীপুর), দেবযানী ও দেবব্রত ঘোষ (গড়িয়া), দামোদর কৃষ্ণ সিংহ (রাণাঘাট, নদীয়া), জগৎ চক্ষু দাস (ডিব্রুগড়, আসাম), সৌপ্তিক ঘোষ, নন্দিনী রায়, রাজলক্ষ্মী রায়, পূজা হালদার (বাঘাযতীন, কলকাতা), অঙ্কুরিতা ঘোষ, প্রিয়া দাস, দেবযানী পাল (তাহেরপুর, নদীয়া), পৃথা বিশ্বাস (গৌরনগর, নদীয়া), হৈমন্তী ও মহাশ্বেতা মন্ডল (সর্বাঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ), অর্ঘ্য ও লতাশ্রী রায়গুপ্ত (খড়ীয়া, বীরভূম), দেবব্রত পাঁজা, শ্যামসুন্দর পাঁজা (মিহিটিকিরী, পূর্বমেদিনীপুর), মঞ্জরী দেবনাথ (কল্যাণী), চৈতালী সামন্ত (হুগলী), মোহর দে (হাওড়া), কল্যাণী, ঊর্জেশ্বরী আদক (কুশপতা, পশ্চিম মেদিনীপুর), হৃষীকেশ ও সুদেবী মন্ডল (রামপুর হাট, বীরভূম), সুনন্দ ও সুদেবী বণিক (ত্রিবেণী, হুগলী) সুদীপা মন্ডল (পাটুলী, দক্ষিণ ২৪পরগনা)।

তোমরা যারা সঠিক উত্তর লিখতে পারোনি, তারা লক্ষ্য করো ঃ-

১) নিত্যানন্দ প্রভু বীরভুমে একচক্রা গ্রামে আবির্ভূত হন। ২) চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে স্বয়ং কৃষ্ণ অবতীর্ণ। ৩) অদ্বৈত আচার্য প্রভুর টোলে বিশ্বরূপ ও তাঁর ভাই নিমাই পড়াশুনা করেন। ৪) হরিদাস ঠাকুর দিনরাত সমস্ত কষ্ট সহ্য করে হরিনাম করতেন। ৫) হনুমান পবনদেবের পুত্র। ৬) মহাদেব কালকূট বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হন। ৭) গরুড়দেব বিষ্ণুবাহন নামে খ্যাত। ৮) সুনীতি ধ্রুব মহারাজের মাতা। ৯) সুভদ্রা বসুদেব ও দেবকীর কন্যা। ১০) যম সূর্যদেবের পুত্র।

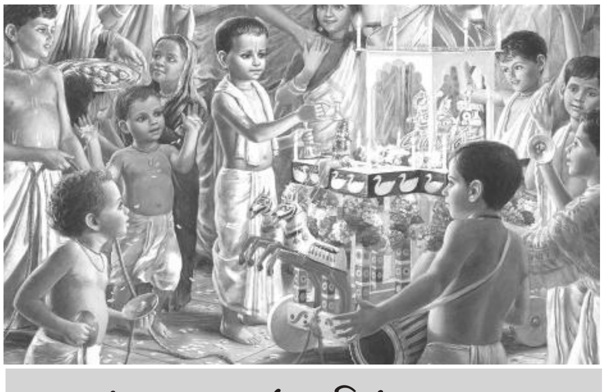

জপ করুন আনন্দিতে থাকুন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য

রাধাবিনোদিনী দাসী (বিন্তি বণিক)

অক্ষয় শব্দটির আক্ষরিক অর্থ যার ক্ষয় বা বিকার নেই। কিন্তু অক্ষয় তৃতীয়া ব্যাপারটি কি? তৃতীয়া যা কিনা অক্ষয়। প্রতি বছরের বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিটিকে বলা হয় অক্ষয় তৃতীয়া। এই তিথিকে অক্ষয়তীজ্ বা পরশুরাম জয়ন্তীও বলা হয়। এটি মাহাত্ম্যপূর্ণ একটি দিন বছরের। আবার ঐ দিন যদি হয় সোমবার আর রোহিণী নক্ষত্র সমাসীন, তবে তো কথাই নেই। দিনটি আরও বেশী বিশিষ্টতা পায়। বৈশাখ মাসের এই বিশেষ দিনে দেখা গেছে নানাবিধ মহতী কর্মের সূচনার পরম্পরা। আমাদের অতীত ইতিহাস অবলোকন করলে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই দিনে ঘটতে দেখা যায়, যার পরিণাম ফল আজও ক্ষয়হীন হয়ে সময়ের স্রোতের সঙ্গে নিরবধি বয়ে চলেছে। তাই তো আবহমান কাল থেকে এই দিনে অনুষ্ঠিত যে কোন শুভ কার্যানুষ্ঠানের পুণ্যফল অক্ষয় বলে ধার্য হয়। 'অক্ষয় তৃতীয়া' আখ্যা তাই সার্থক। এ তিথি যে বাস্তবিকই অক্ষয়, তার প্রমাণস্বরূপ অতীতে, পুরাণে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটেছে তার বিবরণী প্রসঙ্গ হল—

১) এই তিথিতে সত্যযুগের সূচনা হয়।

২) এই তিথিতে পুণ্যতোয়া, পুণ্যসলিলা ভগবতীদেবী গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করেন। তারপর থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অক্ষয় জলসম্ভার সমেত মর্ত্যবাসীর জীবনদায়িনী তথা পাপনাশিনী নদীরূপে বহমানা।

৩) ভগবানের দশ অবতারের অন্যতম ষষ্ঠ অবতার 'পরশুরামদেব' এই তিথিতেই আবির্ভূত হন অবনীমাঝে। তিনি তো চিরঞ্জীবী। অমর, অক্ষয় আয়ু নিয়ে আজও মর্ত্তচারী। তাই এ তিথির আর এক নাম 'পরশুরাম জয়ন্তী'।

৪) এই তিথিতেই ব্যাসদেব মহাভারত রচনা শুরু করেন। মহাভারতের মধ্যে ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত আঠারো অধ্যায় 'গীতা'য়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী রয়েছে, যা অনন্তকাল হতে আমাদের ভবসাগর উত্তরনের অক্ষয় পথপ্রদর্শক।

৫) দেবী পার্বতীর অপর এক রূপ 'মা অন্নপূর্ণা' এই তিথিতেই আবির্ভূতা হয়ে মহাদেবকে অন্নভিক্ষা দেন। তারপর

থেকে অন্নের অক্ষয় উৎসস্বরূপা রূপে দেবী পূজিতা হন।

৬) এই তিথিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বান্ধব সুদামা বিপ্র দ্বারকাতে তাঁর প্রাসাদে আসেন, নিজের দারিদ্রাবস্থার কথা জানিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য লব্ধ হতে। কিন্তু 'অতিথি দেবঃ ভবঃ' এবং 'ব্রাহ্মণ নিত্য পূজ্য'— এই জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্র সুদামাকে যে আতিথেয়তা করেন, তাতে

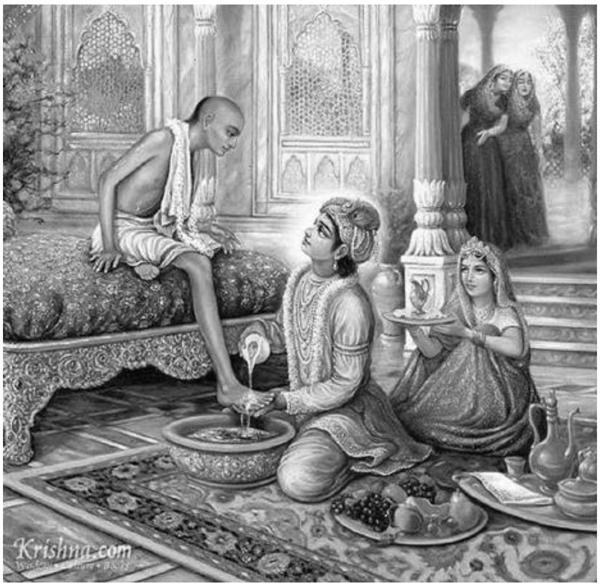

মুগ্ধ হয়ে সুদামা আর নিজের দৈন্যাবস্থার কথা মুখ ফুটে বলতে পারেননি। এমনকী কৃষ্ণের প্রাসাদে সম্পদের বৈভব দেখে, তাঁর জন্য আনা কাপড়ে বাঁধা সামান্য চালভাজাটুকুও লজ্জায় আর দিতে পারেননি সুদামা। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান বাসুদেব যে ভাবগ্রাহী। তিনি ভাবটুকু গ্রহণ করেন, কেবল ভেট নয়। তাই নিজেই সেই চালভাজা চেয়ে খেয়ে পরমতৃপ্ত হন। আর সুদামা বিপ্র নিজমুখে কিছু না চাইলেও, বাড়িতে ফিরে দেখেন যে তার ক্ষুদ্র কুটীরের পরিবর্তে বৃহৎ অট্টালিকা অবস্থান করছে সেখানে। শ্রীভগবান অযাচিত করুণাভরে সবকিছু সাজিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁর একান্ত প্রিয় বান্ধব তথা ভক্তপ্রবর সুদামাকে। এই লীলার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, ভক্তের চাওয়ার অপেক্ষা করেন না ভগবান। অহৈতুকী অযাচিত কৃপা অক্ষয়রূপে তিনি নিজে থেকেই করেন তাঁর নিষ্কাম ভক্তের প্রতি। সত্যি, তাঁর মতো সুহৃদ, তাঁর মতো পরম বান্ধব আর কে আছেন?

৭) দুর্যোধনের নির্দেশে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে দুঃশাসন এই তিথিতেই। কিন্তু দ্রৌপদী যখন পূর্ণ বিশ্বাসসহ শরণাগতি স্বীকার করে আত্মনিবেদন করলেন মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের চরণে, তখন ভগবান অনন্ত বস্ত্রের যোগান দিয়ে তাঁর সম্মান রক্ষা করলেন। পূর্ণরূপে ভগবানের চরণকমলে আত্মনিবেদিত হতে পারলে যে ভগবানই রক্ষাকর্তা হয়ে অক্ষয় কৃপা করেন — এ লীলা তারই নিদর্শন।

৮) কথিত আছে — অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই সূর্যদেব পান্ডবদের বনবাসের সময় অক্ষয় পাত্র দান করেন। একথালা অন্ন দ্রৌপদীর আহার গ্রহণের আগে পর্যন্ত যতজন উপস্থিত থাকতো তাদেরকে খাওয়ানো যেত।

৯) দীর্ঘকাল তপস্যার পর মহাদেবকে প্রসন্ন করে যক্ষরাজ কুবের স্বর্গের সমস্ত ধনসম্পত্তির অধিকারী দেবতা হন এই তিথিতেই।

১০) এই তিথিতেই প্রতিবছর পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের নির্মাণকার্যের শুভ সূচনা হয়। ভক্তবৎসল জগন্নাথদেব ভক্ত দর্শনের জন্য রথযাত্রা করেন, আর ভক্তদের প্রতিও তাঁর অক্ষয় কৃপা যে স্বয়ং ভগবান মন্দির থেকে পথে আসেন তাঁদের দর্শনসুখ দিতে।

১১) প্রবাদ আছে — এই তিথিতেই ভিক্ষা করতে গিয়ে আদি শঙ্করাচার্য এক নিঃসম্বল দম্পতির থেকে, তাদের কুটীরের একমাত্র খাদ্যবস্তু একটি — টেপারি ফল প্রাপ্ত হলেন। নিদারুণ দৈন্যাবস্থা সত্ত্বেও ক্ষুধায় কাতর দম্পতির ভিক্ষাদানে এমন আগ্রহ দেখে শঙ্করাচার্য 'কলকাধার' নামক বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা করেন, যা তার এক অক্ষয় কীর্তি।

১২) 'গোয়া' ও 'কেরল' এই তিথিতেই পরশুরাম ক্ষেত্র নামে চিহ্নিত হয়।

অতএব, আন্দাজ করা যাচ্ছে যে, অক্ষয় তৃতীয়া তিথি পরম মহিমাময়। এই তিথিতে যা শুভকর্ম করা হয়, তার ফল

অক্ষয় পুণ্যদায়িনী। যা জ্ঞান আহরণ করা হয়, এই তিথিতে—তাও অক্ষয় প্রভাব ফেলে বুদ্ধিতে, চিত্তে। দানের ফলও অক্ষয় হয়। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাহলে এই তিথিতে যদি ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতে যদি কোন পাপকর্ম করে ফেলি, তবে সেটাও অক্ষয় পাপ হয়ে কর্মফলের খাতায় লেখা থাকে। তাই সতর্ক থাকাটাই শ্রেয়। অজান্তেও কোন পাপ বা বৈষ্ণব অপরাধ, সেবাপরাধ, নামাপরাধ না করে ফেলি বা কোন কুভাবনা না ভাবি — সে বিষয়ে সজাগ থাকাটাই সমীচীন। তাই এই মাহাত্ম্যপূর্ণ তিথিতে ভাগবত শ্রবণ, শ্রীনামসংকীর্তন, সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন, অর্চন-বন্দন, শ্রীগুরুসেবা, সাধুসঙ্গ, মালা জপ — বেশী করে মনকে গৌর-গোবিন্দের শ্রীচরণসেবায় ব্যস্ত রাখবো।

'যার থাকবে গৌরপ্রেমে রতি,
কলি তার করবে কোন্ ক্ষতি?'

অক্ষয় তৃতীয়ায় ক্ষয়হীন কৃপা এভাবেই একমাত্র লব্ধ করা সম্ভব।

রাধাবিনোদিনী দাসী (শ্রীমতি বিন্তি বণিক) বিগত ২০ বৎসর ধরে ভক্তি জীবনে যুক্ত আছেন। বর্তমানে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র পার্ষদবৃন্দের জীবনী লেখনীর সুমহান কার্যে ব্রতী আছেন।

এই তিথিতে একুশ দিন ধরে চন্দন যাত্রা উৎসব হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাহক নবীকরণ বিজ্ঞপ্তি

হরেকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ করুন। **মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' / পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার'** পত্রিকার আপনি একজন গ্রাহক। আপনার গ্রাহক পদের মেয়াদ কি শেষ হয়ে গেছে বা বর্তমান / আগামী সংখ্যায় শেষ হচ্ছে? সেটি জানতে লক্ষ্য করুন–

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' পত্রিকার খামে যেখানে আপনার নাম, ঠিকানা রয়েছে তাতে আপনার গ্রাহক নম্বরের পাশেই পত্রিকার গ্রাহক মেয়াদ কবে শেষ হবে বা শেষ হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে– যেমন– BDM-14225, Ex- 40(03) - 41(02) -এর অর্থ হল আপনার গ্রাহক নম্বর BDM-14225 এবং ৪০ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় আপনার গ্রাহক মেয়াদ শুরু হয়েছে এবং ৪১ বর্ষ ২য় সংখ্যায় আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। **পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার'** পত্রিকার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে দেখে নিন কবে গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। **এই বিজ্ঞপ্তির ডানদিকে নিচের দিকে টিক ☑ চিহ্ন লক্ষ্য রাখুন কোন্ সংখ্যাটি আপনার পত্রিকার মেয়াদের শেষ সংখ্যা।**

মাসিক **'ভগবৎ-দর্শন' পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ১০০ (একশ) টাকা** এবং পাক্ষিক **'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা**। আপনি মানি-অর্ডার করে উক্ত টাকা পাঠিয়ে পুনরায় এক বা একাধিক বছরের জন্য আপনার গ্রাহক পদে স্থিত থেকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিয়োজিত থাকুন। আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে বড় অক্ষরে লিখবেন এবং আপনার পোষ্টাল পিন কোড উল্লেখ করবেন।

বিঃ দ্রঃ- মানি-অর্ডার ফর্মের শেষ অংশে আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, পোষ্টাল পিন কোড লিখুন এবং আপনার গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করুন। হরেকৃষ্ণ!

গ্রাহক ভিক্ষা পাঠানোর ঠিকানাঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর,
নদীয়া-৭৪১৩১৩।
ফোনঃ ০৩৪৭২-২৪৫২১৭, ২৪৫২৪৫

যাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করা হয়েছে, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য নয়।

বুক পোষ্টে ভগবৎ-দর্শন ও হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার পত্রিকার গ্রাহক-ভিক্ষা
১ বছরের জন্য - ১৫০ টাকা
৫ বছরের জন্য - ৬৭৫ টাকা
১০ বছরের জন্য - ১৩০০ টাকা

ক্যুরিয়ার সার্ভিস যোগে পত্রিকা দুটির গ্রাহক-ভিক্ষা
১ বছরের জন্য - ৩০০ টাকা
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে–
১ বছরের জন্য - ৪৯০ টাকা

রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পত্রিকা দুটির গ্রাহক-ভিক্ষা
২৮০ টাকা (এক মাস অন্তর)
৪২০ টাকা (প্রতি মাসে)

আগামী সংখ্যা শেষ সংখ্যা, নবায়নের জন্য ভিক্ষা পাঠান।

এটিই শেষ সংখ্যা, অবিলম্বে নবায়নের জন্য ভিক্ষা পাঠান।

শুনহে রাম কাহিনী

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

ভগবান তাঁর নিত্যধামে সব সময় তাঁর নিত্য পার্ষদদের নিয়ে লীলা বিলাস করছেন। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ আছে ভগবানের অনন্ত রূপ আছে — 'অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্' ভগবান অনন্ত রূপে অনন্ত ধামে তাঁর নিত্য পার্ষদগণকে নিয়ে লীলা বিলাস করছেন।

কিন্তু ভগবান কখনো কখনো তাঁর প্রিয় ভক্তদের আহ্বানে 'সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি' সপার্ষদগণ সহ অবতরণ করেন। যেমন ভগবান রামচন্দ্র এই জগতে অযোধ্যাধাম সহ অবরতন করেছিলেন। ইন্দ্র, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, এমন কি ব্রহ্মাজির মতো ভক্তদের আহ্বানে মহা পরাক্রমশালী অসুর রাবণের হাত হতে জগতকে রক্ষা করার জন্য এবং নিজের জীবনের আচরণের মাধ্যমে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য ভগবান রামচন্দ্র নিজ পার্ষদ সহ অবতরণ করেছিলেন এবং ১১০০০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

ভগবান রামচন্দ্রের মধুর নাম শ্রবণ করা মাত্রই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলা হয় 'রময়িতি ইতি রাম'। যাঁর লীলা সকলকে আনন্দ প্রদান করে। এক সময় শিবজী পার্বতীকে বলেন, 'হে বরাননে (হে সুন্দরী), 'রাম' 'রাম' বলে মনোরম যে নাম, তাতে আমি রমন করি'।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি পথে চলতে চলতে কীর্তন করতেন —

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্।।
এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গা স্নান।।

ভগবানের এই মধুর নামের প্রতি, তাঁর লীলার প্রতি জগতের কিছু মানুষ আছে যারা ভগবানের মধুর নাম ও অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চায় না। বিশেষ করে কিছু সম্প্রদায়ও আছে এবং জাগতিক বিচারে যাদের সাধারণ মানুষ শিক্ষিত বলে মনে করে তাদের মতামতকে ঠিক বলে মনে করে।

এই রকম একজন ভাল শ্রদ্ধাবান লোক নাস্তিক মানুষের পাল্লায় পড়েছিলেন। একজন ইসকনের প্রচারক ভক্তকে দেখে নাস্তিক লোকটির মতো প্রশ্ন করলেন, 'হে সাধুবাবা আপনি বলুন — লাখ লাখ বৎসর আগে ভগবান যে লীলা বিলাস করেছিলেন তা কে দেখেছিলেন? আসলে এই সকল কাহিনীর মাধ্যমে লোকের মনোরঞ্জন করে কিছু শিক্ষা প্রদান করা হয়, যাতে মানুষ সঠিক পথে চলতে পারে। বাস্তবিক এই গুলি কাল্পনিক। কারণ রাম জন্মগ্রহণ করার ষাট হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচনা কিভাবে হলো আর আপনি বলুন, যিনি নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেন না তিনি কি করে ভগবান হলেন? তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম নামে কিভাবে জগতে বিখ্যাত হলেন'?

ভক্তটি হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখুন আপনি তো ভাগবত নিলেন এবং গীতা গ্রন্থটি আপনাকে ফ্রি দিলাম। আপনি গীতার ৭/১৫ নম্বর শ্লোকটির তাৎপর্য পড়বেন এবং ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের তিন নম্বর শ্লোকটি ভাল করে পড়বেন। তাহলে বুঝতে পারবেন (৯/১০/৩)'। শ্রদ্ধাবান লোকটি ভক্তটিকে বললেন, 'ভাগবতের প্যাকেটটি খুলতে হবে না। কিন্তু গীতাটি খুলে একটু দেখিয়ে বলুন'।

ভক্তটি বললেন, এই শ্লোকে 'দুষ্কৃতিনো' কথাটি মানে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন 'কৃতি' মানে বুদ্ধিমান কিন্তু তাদের বুদ্ধিটা ভাল কাজে না লাগিয়ে দুষ্ট কাজে ব্যবহার করেছে — তাই যারা বলেন ভগবানের কার্যকলাপ কাল্পনিক তাদের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধিটা জড় তাই তারা সাধুদের কথা, শাস্ত্রের

কথায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু আপনি সেই রকম নন। কারণ আপনি সৎ বলে আপনার মনের কথা বললেন — ঠিক যেমন দক্ষিণ ভারতের রামদাস বিপ্র নামে একজন রামভক্ত ছিলেন তিনি রামায়ণ পড়তে পড়তে যখন পড়লেন — সীতা ঠাকুরাণী জগতের মা মহালক্ষ্মী, তাঁকে একটা রাক্ষস স্পর্শ করেছে, তখন থেকে খাওয়া বন্ধ করে কান্না করছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কুর্মপুরাণ থেকে প্রমাণযোগ্য সব কথা বললেন এবং নিজের হাতে দেখালেন যে রাবণ ছায়া সীতাকে হরণ করেছে — আসল সীতাকে অগ্নিদেব রেখে দিয়েছেন তখন রামদাস বিপ্র বুঝতে পারলেন। ঠিক তেমনি আপনি যখন গ্রন্থগুলি পড়বেন তখন সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যাবে।

ভক্তটি বললেন, আমার মনের মধ্যেও এই রকম প্রশ্ন ছিল কিভাবে লিখতে পারেন মহামুনি বাল্মীকি রামজন্ম গ্রহণ করার ষাট হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণ। কিন্তু শাস্ত্রের কথা অভ্রান্ত আমার বিশ্বাস ছিল তাই একদিন যখন গুরু মহারাজের কাছ হতে একটা ক্লাসে শুনলাম — ভগবান তিনভাবে লীলা বিলাস করে থাকেন, ১) তাঁর নিত্যধামে তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদ নিয়ে সব সময় লীলা বিলাস করেন, ২) তিনি যখন ভক্তদের আহ্বানে এই ভৌম জগতে আসেন তখন লীলা বিলাস করেন, ৩) ভগবান কখনো কখনো তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে লীলা বিলাস করেন।

একসময় মহামুনি বাল্মীকি তমসা নদীর তীরে বসে আছেন তাঁর আশ্রমে এবং চিন্তা করছেন এই জগতে এমন কোন আদর্শ ব্যক্তি আছেন যিনি সর্বগুণ সম্পন্ন। এই রকম প্রশ্নের চিন্তায় যখন চিন্তিত ছিলেন তখন হঠাৎ সেখানে গুরুদেব নারদমুনি এসে উপস্থিত হলেন। গুরুদেবকে দন্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে ঐ একই প্রশ্ন করেন। নারদমুনি ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। তিনি সব কিছুই জানেন — তাই সর্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ ব্যক্তি ভগবান রামচন্দ্র সম্বন্ধে সব কিছু বললেন এবং শ্রবণ করে মহানন্দে স্নান করার জন্য যখন শিষ্য ভরদ্বাজমুনিকে নিয়ে তমসা নদীর তীরে গেলেন সেই সময় হঠাৎ দেখলেন একটা ক্রৌঞ্চ পক্ষী (সারস পক্ষী) তার সামনে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ল। সেই সময় এক ব্যাধ সেখানে দৌড়ে এল। দেখা মাত্রই ক্রোধে বাল্মীকি মুনি তাকে অভিশাপ দিলেন সংস্কৃত ভাষায় এবং অনুষ্টুপ ছন্দে। সেটি তিনি বারবার আবৃত্তি করে খুব আনন্দিত হয়ে আশ্চর্য হলেন। এটি কি ভাবে সম্ভব আমার পক্ষে। সেই সময় সম্মুখে স্বয়ং ব্রহ্মাকে দেখলেন — দেখা মাত্রই দন্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা বললেন, আমি তোমার মুখ দিয়ে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়েছি, তুমি রামায়ণ রচনা কর। প্রভু এই জগতে আসবেন, লীলা বিলাস করবেন— এই কথা বলেই চলে গেলেন। তিনি খুব চিন্তিত হলেন — কি ভাবে রামায়ণ রচনা করবো। পরে ব্রহ্মাজির নির্দেশ গ্রহণ করে গুরুদেব যে সারসংক্ষেপ বলেছিলেন তা

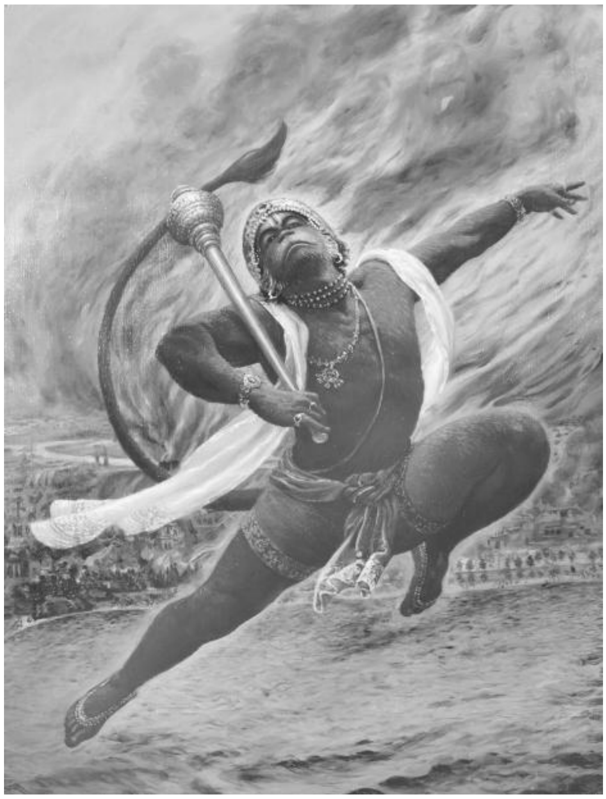

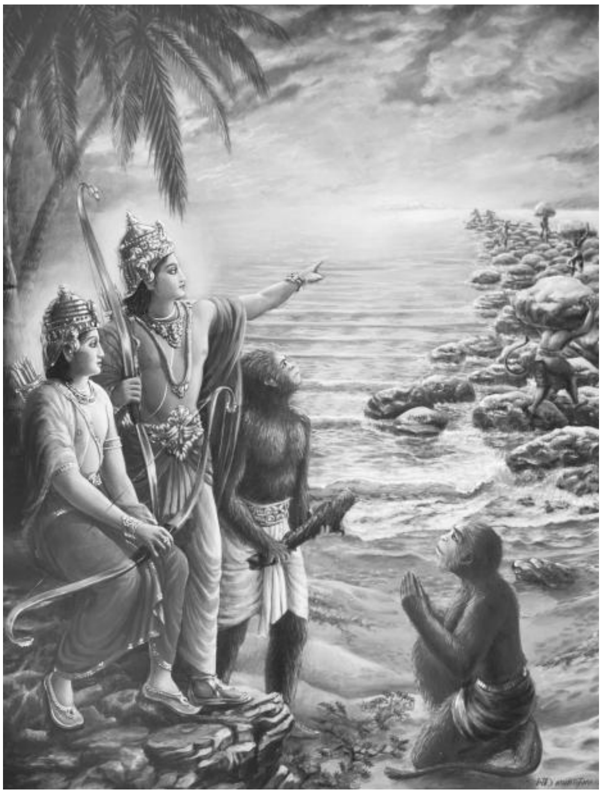

স্মরণ করে এবং ভগবান রামচন্দ্রকে স্মরণ করে লিখতে শুরু করলেন। তখন অন্তর্যামী ভগবান রামচন্দ্র হৃদয়ে অবস্থান করে তিনি এমনভাবে তাঁর লীলাবিলাস লেখালেন যেন তিনি সব কিছু নিজের চোখে দর্শন করছেন। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যদি মাছ তার দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ডিম থেকে বাচ্চা তৈরী করতে পারে, কচ্ছপ যদি ধ্যান করার মাধ্যমে তার ডিম থেকে বাচ্ছা তৈরী করতে পারে — আর যিনি অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। তাই ভগবান বলেছেন গীতায় ৭/২৬ নং শ্লোকে — 'হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না'। ভগবানের কথা সাধু-গুরু বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হতে যখন শ্রবণ করব তখন সহজে বুঝতে সুবিধে হবে।

একসময় আমি শ্রীমৎ সুভগ স্বামী গুরু মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলাম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লীলা পুরুষোত্তম বলা হয়, তেমনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয় কেন? তখন তিনি একটি কাহিনীর মাধ্যমে বোঝাতে চাইলেন —

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে একটি কুকুর সঠিক বিচার চাইলো। লক্ষ্মণ প্রহরীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাই বাধা দিতে চাইলেন। কুকুরটি বলল, 'হয় আপনি আমার সঠিক বিচার করুন, নয় প্রভু রামচন্দ্রের কাছে যাওয়ার পথ ছাড়ুন'। লক্ষ্মণ বললেন,'কি বিচার'? কুকুর বলল, 'এক সন্ন্যাসী আমাকে মেরেছে। আপনি কি তার সঠিক বিচার করতে পারবেন? না হলে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।' কুকুরের কথা শুনে লক্ষ্মণ ভয় পেয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি রাজার কাছে চলে যাও।' কুকুর রাজা রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে বিচার চাইল। লক্ষ্মণ কৌতুহল বশতঃ পেছন পেছন গেলেন। ব্যাপারটা কি, শুনতে হবে।

কুকুর বলতে লাগল, 'হে প্রভু, আপনি রাজ সিংহাসনে বসে আছেন। দয়া করে আমার বিচার করুন।' শ্রীরামচন্দ্র বললেন, 'কি হয়েছে তোমার, ব্যাপারটা নির্ভয়ে খুলে বল।' তখন কুকুরটি খুলে বলতে লাগল,'আমি রাস্তায় শুয়েছিলাম। একজন সন্ন্যাসী এসে তাঁর দন্ড দিয়ে আমাকে মেরে সরতে বলল, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার শরীর এত দুর্বল ছিল যে, আমি সরতে পারলাম না। তখন সন্ন্যাসী আমাকে মারতে শুরু করলেন। দেখুন, আমার শরীরে কত জায়গায় ফেটে গেছে — রক্ত বার হচ্ছে।' তখন ভগবান রামচন্দ্র সব শুনলেন, মন্ত্রীবর্গ সকলে শুনলেন এবং ব্রাহ্মণগণ সব শুনলেন। তখন ভগবান রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে বললেন, 'তাহলে এখন বলুন কি করা উচিত?' ব্রাহ্মণগণ

সিদ্ধান্ত দিলেন আগে সন্ন্যাসীকে ডাকা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীকে ডেকে আনা হলো।

সন্ন্যাসীকে সম্মান জানিয়ে রাজা রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি কুকুরটিকে বিনা অপরাধে মেরেছেন?' সন্ন্যাসী বললেন, 'না প্রভু, বিনা অপরাধে মারিনি। আমি গঙ্গা স্নান করে আসছিলাম, পথে এমন ভাবে শুয়েছিল পাশ দিয়ে যাওয়ারও সুযোগ ছিল না। কিন্তু ডিঙিয়ে যাওয়াও ঠিক হবে না। তাই আমি আমার দন্ডটা দিয়ে প্রথমে সরে যেতে বলি। কিন্তু সরল না। একটু চোখ খুলে দেখে আবার শুয়ে পড়ল।' তখন কুকুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'সন্ন্যাসী যা বলেছে তা কি ঠিক?' কুকুরটি বলল, 'হ্যাঁ প্রভু, এটা ঠিক। কিন্তু আমি দুদিন কিছু খাইনি তাই আমার শরীর খুবই দুর্বল ছিল, তাই নড়ার কোন ক্ষমতা ছিল না।' তখন রাজা রামচন্দ্র সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি অন্য পথে গেলেন না কেন? আপনার ওকে মারা উচিত হয়নি এমনভাবে।'

রাজা রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকে বললেন, 'এখন আপনারা বলুন কি করা উচিত।' ব্রাহ্মণগণ বললেন, 'সন্ন্যাসীর গঙ্গা স্নান বন্ধ করে দিন — এটাই একজন সন্ন্যাসীর উপযুক্ত শাস্তি হবে।' কিন্তু কুকুরের মনে কোন আনন্দ নেই দেখে রাজা রামচন্দ্র বললেন, 'কুকুর তুমি কি এই বিচারে সন্তুষ্ট?' কুকুর বলল, 'না প্রভু আমি সন্তুষ্ট নই।' তখন ব্রাহ্মণগণ বললেন,'কি শাস্তি দিতে চাও তুমি?' তখন কুকুর বলল, 'কালাঞ্জর মঠের প্রধান হতে আদেশ করুন।' তখন সভার সকলেই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি এর রহস্য? রাজা রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে কুকুর উত্তর দিল, 'যিনি কালাঞ্জর মঠের প্রধান হবেন— তিনি অপরাধ করবেন আর পরবর্তী জন্মে আমার মতো কুকুর হবে। তখন কুকুর-শরীর পাওয়ার কষ্ট বুঝতে পারবে। তাই আমি এই বিচার চাই।' তখন ভগবান রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বিচার কি সঠিক হল?' তখন সমস্ত ব্রাহ্মণগণ সম্মতি জানালেন। এই কাহিনীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম রাজা রামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রিয়। তিনি যদিও ছিলেন রাজা কিন্তু সম্মান হিসেবে মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের উচ্চ আসন থেকে নীচে নামালেন না। তিনি ভগবান, সব কিছুই জানেন — বিচার নিজের হাতে করতে পারতেন, কিন্তু মর্যাদা লঙ্ঘন করলেন না। কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে — ক্ষত্রিয় থেকে উন্নত ব্রাহ্মণ। তাই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয়।

ভগবানের কার্যকলাপ যখন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখ হতে শ্রবণ করব তখন আর মনে কোন সন্দেহ থাকবে না, মন তখন দিব্য আনন্দ অনুভব করবে। জয় ভগবান রামচন্দ্র কি জয়!

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। এই বৎসর শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রী সম্প্রদায়

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

বৈষ্ণবরা প্রধানত চারটি মুখ্য বৈষ্ণবীয় বিদ্যালয় বা সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেন। ব্রহ্ম, শ্রী, রুদ্র এবং কুমার সম্প্রদায়। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য শ্রী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। বৈষ্ণবীয় বিদ্যালয় বা বিষ্ণু পূজার সূচনা হয়েছিল ভগবান বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী বা শ্রী থেকে। তাঁর বেদান্ত ভাষ্য শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের পরিপন্থী ছিল। মূলত দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষাভাষী লোকেদের কাছে আজ শ্রী সম্প্রদায়-ই মুখ্য। তিনি বেদান্ত দর্শনকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা বিশেষ অদ্বৈতবাদ নামে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর বেদান্তের ওপর বহু ভাষ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ভাষ্য হচ্ছে শ্রীভাষ্য, ভগবদ্ গীতার টিপ্পনী, বেদান্ত সার এবং বেদার্থ সংগ্রহ।

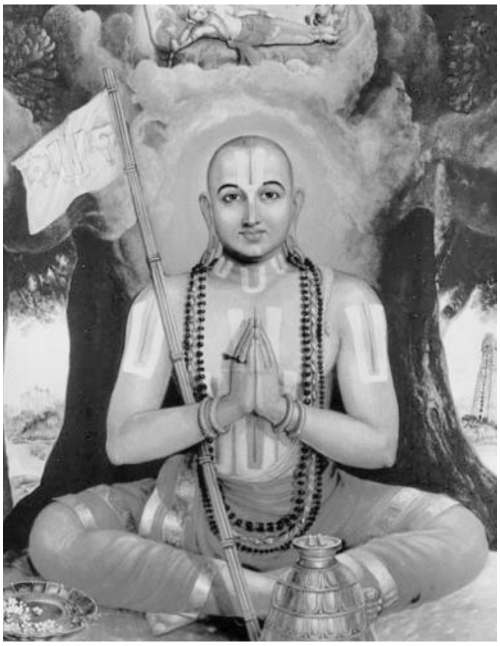

শ্রী রামানুজ আচার্য ১০১৭ সালে চৈত্র মাসে (এপ্রিল-মে) আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রী রামানুজের পিতা কেশবাচার্য বৈদিক যাগ যজ্ঞের প্রতি অধিক মাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। যখন রামানুজ যুবা অবস্থা প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি তাকে বেদ, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার জন্য সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। যদিও রামানুজ ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তথাপি তিনি গোঁড়া তামিল স্তবের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণু পূজাকে প্রকাশিত করেন নি। তাঁর স্বাভাবিক ভক্তি ইতিমধ্যেই কাঞ্চীপূর্ণ নামে শ্রীযামুনাচার্যের এক অব্রাহ্মণ ভক্তের সঙ্গ করে জাগ্রত হয়েছিল এবং শ্রী রামানুজ তার বাল্য অবস্থা থেকেই অত্যন্ত সদাচারী ছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু ধর্মের আচারনিষ্ঠ শুদ্ধিকরণ পন্থাগুলি অনুশীলন করেছিলেন, তাঁর উপনয়নও হয়েছিল এবং ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ করেন।

বিবাহের মাত্র একমাস পরে রামানুজের পিতা ঘোর ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর রামানুজ তাঁর স্ত্রীর সহিত কাঞ্চিপুরমে গমন করেন। সেখানে তিনি যাদব প্রকাশের নৈর্ব্যক্তিক বেদান্তবাদ সংস্কৃত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। শ্রীরামানুজ অতি শীঘ্রই যাদব প্রকাশের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে অতি উৎকর্ষতা লাভ করেন এবং শিক্ষকের অতি প্রিয় ছাত্রে পরিণত হন। যাদব প্রকাশ অদ্বৈতবাদের ধর্মীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং সমস্ত মায়া প্রকৃতি এবং বিষ্ণু তত্ত্বের উপরে আলোকপাত করেন। যেহেতু রামানুজের ভাব ভগবান বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য ছিল তাই এই ব্যাখ্যা তার মনে বিরাগভাবের জন্ম দিল। তথাপি তিনি শিক্ষাগুরুর সম্মানার্থে বিতর্ক এড়িয়ে গেলেন।

শীঘ্রই সেই দিন উপনীত হল যখন তিনি যাদব প্রকাশের নৈর্ব্যক্তিক অদ্বৈতবাদকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। একদিন রামানুজ তাঁর গুরুদেবের পৃষ্ঠমর্দন করছিলেন তখন যাদব প্রকাশ ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি ভাষ্যের ব্যাখ্যা করছিলেন। ভাষ্যটিতে কপিশ্যম্ পুন্ডরীকম্ এবম্ আক্ষিণী শব্দটি ছিল। এতে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যকে অনুকরণ করে যাদব প্রকাশ ব্যাখ্যা করলেন যে, কপি মানে 'বানর' এবং আসনম মানে 'গাধা'। তাঁর গুরুদেবের এই ঈশ্বরনিন্দা তাঁকে খুব ক্রুদ্ধ করেছিল এবং গভীর ক্রোধে তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে উষ্ণ অশ্রু প্রবাহিত হয়ে তার গুরুদেবের পৃষ্ঠদেশে পতিত হলো। যাদব প্রকাশ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্য বিরক্ত হয়েছে এবং বিরক্তির কারণ জানতে চাইলেন। যখন রামানুজ তার গুরুদেবের ব্যাখ্যার ব্যাপারটিকে তার বিরক্তির কারণ হিসাবে ব্যক্ত করলেন তখন যাদব প্রকাশ বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি রামানুজের ব্যাখ্যা চাইলেন। শ্রী রামানুজ কপিশ্যম শব্দের

ব্যাখ্যা করে বললেন, 'যা জলাশয়ের উপর উপবিষ্ট এবং জলপানে সমৃদ্ধ হয়'।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য প্রায় ১২০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় চুয়াত্তরটি শ্রী বৈষ্ণবীয় কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং হাজার হাজার অনুগামীও ছিল। সেই অনুগামীদের মধ্যে অনেক রাজা, জমিদার এবং ধনী ব্যক্তিও ছিল। অগণিত গৃহী ভক্ত ছাড়াও প্রায় সাতশ সন্ন্যাসী ভক্ত, বারো হাজার ব্রহ্মচারী ভক্ত এবং তিনশত মহিলা ছিলেন যারা আত্মত্যাগের অঙ্গীকার করেছিলেন। অবশেষে তিনি যখন দেখলেন যে, এই পৃথিবীতে তার সংকল্পিত কার্য সম্পাদিত হয়ে গেছে তখন তিনি তার নশ্বর দেহত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট বৈকুণ্ঠ ধামে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন। তা জানতে পেরে তাঁর ভক্তরা খুব কান্না করলেন এবং ভাবুক হয়ে গেলেন।

অন্তিম নির্দেশাবলী

তাদের কান্না শুনে শ্রী রামানুজাচার্য বারান্দাতে বেরিয়ে এলেন এবং তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আমার প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা অশিক্ষিত লোকের মতো কেন দুঃখে কান্নাকাটি করছ? তোমরা কি মনে করো এই দেহ চিরকাল থাকবে? আমি কি তোমাদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করব না? তাই এই নিরর্থক বিলাপ বন্ধ কর এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বোঝ।'

নির্মল চিত্তে বিষ্ণুভক্তিই একমাত্র আনন্দ এবং জড়মুক্তির উপায়

এতে সমস্ত শিষ্যরা বলল, 'হে গুরুদেব যেমন আপনার নির্দেশ সর্বদাই নিখুঁত, তা সত্ত্বেও আপনার বিচ্ছেদ ব্যথা আমাদের কাছে অসহনীয় এবং যা আমাদেরকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে।'

শ্রীরামানুজ তাদের প্রতি কৃপা করলেন এবং আরও তিনদিন অধিক অবস্থান করে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা এবং টিপ্পনী প্রদান করলেন —

১) প্রত্যহ বৈষ্ণব পূজা কর এবং সানন্দে তাদের সঙ্গ কর যেমন নিজ গুরুদেবকে পূজা করা হয় এবং তাদের সেবাতে নিবিড় বিশ্বাস রাখ।

২) শাস্ত্র অধ্যয়ন কর এবং উৎসাহী একনিষ্ঠ ব্যক্তিকে শিক্ষা দাও।

৩) গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবানের দিব্য নাম জপ কর এবং ভগবানের দিব্য পরম ভাবকে অনুভব কর।

রামানুজাচার্য মহারাজের তিরোধান

যখন রামানুজাচার্য তার বক্তব্য শেষ করলেন, দাশরথী, গোবিন্দ, অন্ধ্রপূর্ণ এবং আরও কতিপয় প্রধান শিষ্যগণ অগ্রসর হয়ে নিবেদন করলেন যে, 'আপনার দেহ যা সদাসর্বদাই ভগবানের নিত্য সেবাতে লেগেছে, তা কখনো জড় বস্তু হতে পারে না। তাই আমাদের নিবেদন যেন আমরা কখনোই আপনার আপ্রাকৃত অবয়ব দর্শন থেকে বঞ্চিত না হই।'

তাদের প্রতি পরম প্রীত হয়ে রামানুজাচার্য তাদের নিবেদন গ্রহণ করলেন এবং একদল সুদক্ষ ভাস্করকে তার একটি শিলামূর্তি গঠনের নির্দেশ দিলেন। তিন দিন পরে সেই মূর্তি গঠনের কার্য সম্পন্ন হলো। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য ধীরগতিতে মূর্তিটির কাছে এলেন এবং তার মস্তকে শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা সমস্ত শক্তি তাতে প্রতিস্থাপিত করলেন। শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন, 'এটি আমার দ্বিতীয় সত্তা। যখন আমি, আমার এই দেহ ত্যাগ করবো, তখন তোমরা আমার পরিবর্তে এই মূর্তি পূজা করতে পারো।'

তিনি তারপর গোবিন্দের কোলে মাথা, অন্ধ্রপূর্ণের কোলে পা এবং তার পরম গুরুদেবের খড়মের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে শুয়ে পড়লেন এবং শ্রীরামানুজাচার্য তাঁর দেহত্যাগ করে ভগবান বিষ্ণুর পরমধাম বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। এর কিছুদিন পর রামানুজের ভাইপো এবং সর্বক্ষণের সঙ্গী গোবিন্দ এই জগৎ ত্যাগ করলেন।

অন্যান্য ভক্তরা কুরেশা পুত্র শ্রীপরাশর ভট্টের অধীনে থেকে গেলেন এবং চেষ্টা করতে লাগলেন তাদের গুরুদেবের প্রদর্শিত পথে ভগবান নারায়ণের নিরবিচ্ছিন্ন সেবা করতে। পরাশর রামানুজাচার্যের লক্ষ্য বৈষ্ণব মতবাদের সঠিক প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। একটি বিতর্ক সভাতে তিনি বৈদান্তিক মাধব দাসকে পরাজিত করেন যিনি নৈর্ব্যক্তিকবাদের পন্ডিত ছিলেন। তিনি তাকে ভক্ততেও পরিণত করেন। অনেকদিন পর পরাশরের তিরোধানের পর এই মাধব দাস শ্রীবৈষ্ণবদের আচার্য্য হন।

এটি মহান বৈষ্ণব আচার্যদেবদের অপ্রাকৃত চিন্ময়লীলার সিন্ধুর এক বিন্দু মাত্র।

(সম্পর্কঃ এই অনুচ্ছেদটি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের রচনাবলী থেকে গৃহীত)

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষ'র একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি টেক মহিন্দ্রায় কর্মরত।

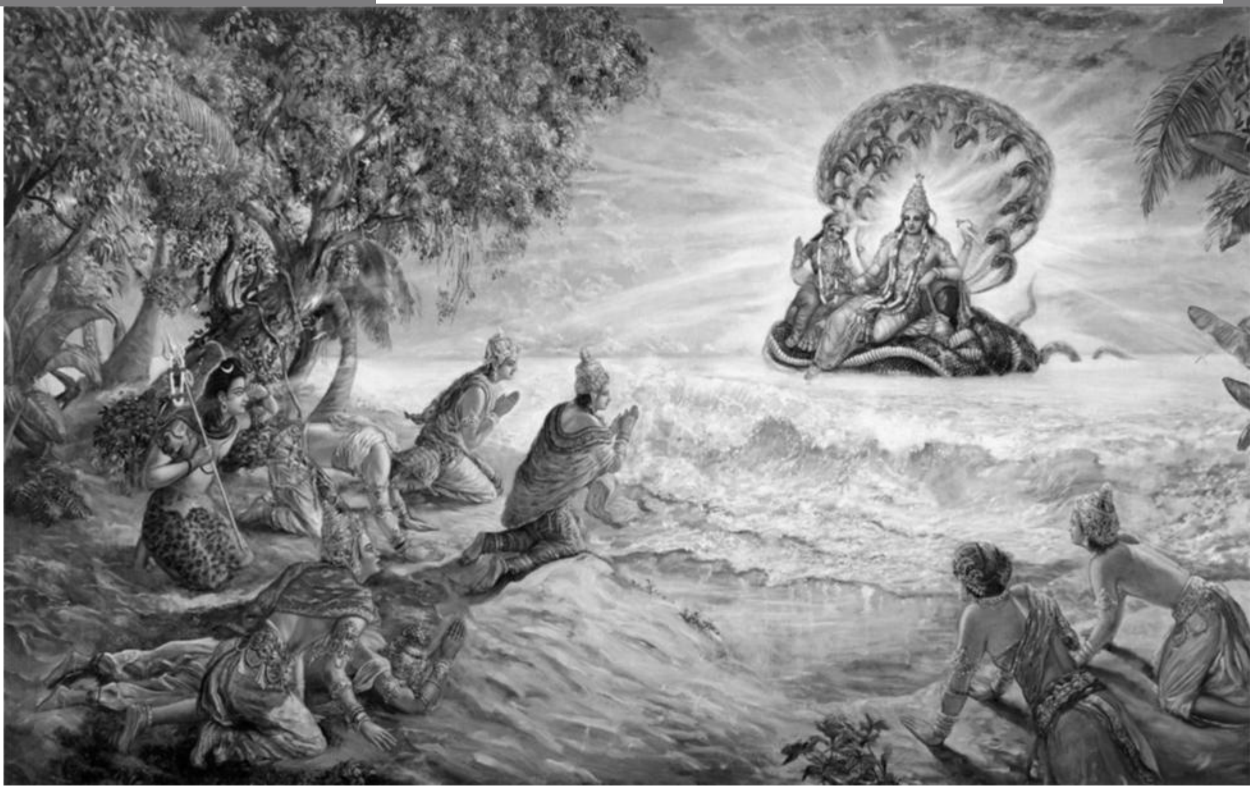

পবিত্রতা ও আদর্শ জীবন

আনন্দবর্ধন দাস ব্রহ্মচারী

পবিত্র থাকলে প্রকৃত ধর্ম একদিন না একদিন প্রকাশিত হবেই। আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা নির্ভর করে মন এবং হৃদয়ের শুদ্ধতার উপর। মনের পবিত্রতা নির্ভর করে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার উপর। বৈদিক সভ্যতায় সমাজকে যথার্থই উন্নত করার জন্য অনেক বিধি নিয়ম রয়েছে। যেমন মনুসংহিতায় মানব সমাজের জন্য বিধিনিয়ম দেওয়া হয়েছে। মনুসংহিতা হচ্ছে মানব জাতির আইন শাস্ত্র। কিন্তু অসুরেরা এই সব অভিজ্ঞ, তত্ত্বদর্শী মুনি-ঋষিদের কথায় কর্ণপাত করতে চায় না। একমাত্র শাস্ত্রীয় বিধান মেনেই আদর্শ জীবনযাপন করা যায়।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।
(গীতা ১৬/৭)

অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্ম বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার ও সত্যতা বিদ্যমান নেই।

কলিতে জীবন ধারণ খুবই কষ্টকর। শ্রবণ, কীর্তনের মাধ্যমে হবে অন্তরের শুদ্ধতা, আর দিনে তিনবার স্নান করে বাহ্যিক শুদ্ধতা। তা যদি সম্ভব না হয়, কমপক্ষে দুবার। তবে একেবারে কম যেন না হয়। পবিত্র সৎ জীবনযাপন করলেই ভগবানের কৃপা লাভ করা সম্ভব হয়।

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে একমনে ভগবানকে ডাকা। সংসারে নানারকম শোক, তাপ, রোগ — এই সব অনিবার্য। ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করলে ঐসব বিষয়ে উদাসীন থাকা যাবে। সংসারে থেকেও তাতে উদাসীন থাকা কম কথা নয়। যে তা পারে, সে তো আদর্শ পুরুষ। সংসারে থেকেও জনক রাজা ঠিক ঠিক উদাসীন ছিলেন। আদর্শ জীবন যাপন করতে হলে ভগবৎভক্তির মাধ্যমে দৈব গুণাবলী বিকশিত করতে হবে যার ফলে আসুরিক মনোভাব সহজেই দূর হবে।

আকবরের নাতি শাহজাহান যখন ভারতের সম্রাট হয়েছিলেন, তার ১৪টি ছেলে-মেয়ে ছিল। তার তৃতীয় পুত্রের নাম আওরঙ্গজেব। সে ছিল খুবই দুষ্ট প্রকৃতির, বদমাশ এবং আসুরিক গুণ সম্পন্ন। সে পরিকল্পনা করেছিল কিভাবে সে পরবর্তীতে রাজা হবে। সেই অনুসারে তার ভাইদের হত্যা করে, তার বাবা শাহজাহানকে বন্দি করে সে সিংহাসন দখল করে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই, অসুরেরা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এমনকি নিজের পরিবারের লোকদেরও হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

স্বার্থপরতা মোটেই ভালো নয়। এমনকি নিজের জন্য ও ভগবানের সেবা বা অন্যের সাহায্য করার আর কি কথা? ভাগবতে উল্লেখ আছে রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রেরা সকলেই কৃষ্ণভাবনায় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাই ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

ফাঁকি দিয়ে মান, যশ, অর্থ লাভ হয়, কিন্তু ভক্তি লাভ হয় না। সাধু গুরুর নির্দেশ মতো চললে ভক্তি লাভ হয়।

অসুর এবং দেবতারা পরস্পর ঝগড়া করে নিজেরা আধিপত্য করতে চায়। নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে। একবার ব্রহ্মা অসুর এবং দেবতাদেরকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। তিনি তাদের স্বভাব ও বুদ্ধি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেইমত তিনি এক সুন্দর পরিকল্পনা করেছিলেন। দেবতা এবং অসুরেরা ব্রহ্মলোকে পৌঁছানো মাত্রই তিনি তাদের বললেন, তোমরা আমার অত্যন্ত প্রিয়। এখানে এসেছো, প্রথমে খাওয়া-দাওয়া করো, বিশ্রাম করো। তবে এই প্রসাদ হলে একটি বিশেষ নিয়ম আছে, সেই অনুসারে তোমাদের সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে।

হলে ঢোকার পূর্বে সকলের হাত লাঠি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তারপর বিশেষ এক পোষাক পরে হলে প্রবেশ করতে পারবে। প্রথমেই অসুরেরা ঐ নিয়ম মেনে হলের মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু ব্রহ্মলোকের প্রসাদ ছিল সুগন্ধ যুক্ত, রসালো আর সুস্বাদু। সেগুলি যখন অসুরদের পরিবেশন করা হয়েছে, তারা বিভ্রান্ত, কি করে খাবে? কেননা হাত ভাঁজ করা যাচ্ছে না। যার জন্য ঠিক ভাবে খেতে পারছে না, চারিদিকে পড়ে যাচ্ছে। তারপর দেবতাদের পালা। একইভাবে যখন দেবতাদের পরিবেশন করা হচ্ছে, তখন ব্রহ্মা দেখলেন দেবতারা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে একে অপরকে খাইয়ে দিচ্ছে। এর থেকে আমরা দেখতে পাই মিলে মিশে থাকার কি আশ্চর্য ফল।

মহাজন মহাপুরুষেরা সর্বদাই স্বার্থপরতা এবং হিংসা ত্যাগ করতে বলেছেন। যে তাদের কথা শুনবে তার কল্যাণ হবেই।

সর্বজীবে দয়া, যথা লাভে সন্তোষ এবং ইন্দ্রিয় সংযম এইগুলি হচ্ছে কয়েকটি উপায়, যার দ্বারা ভক্ত ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন। দয়া প্রদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচার। এই জ্ঞানের অভাবে সারা জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত। তবে মুখে শুধু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'গৌরাঙ্গ' করলে কি হবে? চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা উপদেশ পড়লেই কি হবে? মহাপ্রভু যা বলেছেন তা না করলে কেমন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি হবে। শ্রীল জগদানন্দ পন্ডিত বলেছেন—

'গোরার আমি, গোরার আমি' বললে কভু নয়।
গোরার আচার গোরার বিচার করলে ফল হয়।।

মিথ্যা কথা বলবে, জুয়াচুরি করবে, কত অন্যায় কাজ করবে, এদিকে লোকের কাছে কৃষ্ণনাম করে দেখাবে আমি কত বড় ভক্ত হয়েছি। ফাঁকি দিয়ে মান, যশ ও অর্থ হয়, কিন্তু ভক্তি হয় না। যথার্থ ভক্ত হতে হলে সাধুসঙ্গ করতে হয়। সাধু, গুরু যা বলেন তা পালন করতে হয় — তবে তো ভক্তি হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, সরল জীবন, উচ্চ বিচার এই আদর্শ মেনে চলতে হবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করে তিনি আমাদের এক সরল জীবন প্রণালী দিয়েছেন। কেবলমাত্র পাপ কর্ম (আমিষাহার, নেশা, জুয়া, অবৈধ সঙ্গ) বর্জন করে, শুদ্ধ জীবন যাপন করা। আর সাধুসঙ্গ এবং কলিযুগের যুগধর্ম 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন করা। এই প্রকার পবিত্র জীবনে অনায়াসেই মানুষ মুক্তিলাভ করে ভগবানের চিন্ময় ধামে ফিরে যেতে পারে। এটাই পবিত্র ও আদর্শ মনুষ্য জীবন।

আনন্দবর্ধন দাস ব্রহ্মচারী দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ ইসকন, মায়াপুরের বিভিন্ন প্রচার বিভাগে যুক্ত আছেন। বর্তমানে তিনি বিদ্যালয় প্রচার বিভাগের প্রধান।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

শ্রী নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা, ২০১৭

মায়াপুর, পশ্চিমবঙ্গ ঃ ইসকন মায়াপুর তার বাৎসরিক অষ্টদিবস শ্রী নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা পালন করেছে। এই তীর্থদর্শন পরিক্রমাতে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং অন্যান্য পবিত্র দর্শনীয় স্থানগুলি দেখানো হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই মার্চ পর্যন্ত। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য — শিবির, নৃত্য, জপ, যোগ।

পশ্চিম আফ্রিকায় সর্বজয়ী পুস্তক বিতরক ঃ

ইবাদান, নাইজেরিয়া ঃ ইবাদানের নগর সংকীর্তন দল, ২০১৬ সালে পশ্চিম আফ্রিকার পুস্তক বিতরণ ম্যারাথনে সর্বজয়ী হয়েছে। যদুনাথ দাস প্রভুর নেতৃত্বে সংকীর্তন দলটি ডিসেম্বর মাসে ৯০১টি পুস্তক বিতরণ করেছেন।

ইন্দোনেশিয়া শহরে প্রথম রথযাত্রা ঃ

মনোকেয়ারী, পশ্চিম পাপুয়া, ইন্দোনেশিয়া ঃ ইন্দোনেশিয় রাজ্যে পশ্চিম পাপুয়ার রাজধানী হচ্ছে মনোকোয়ারী। এখানে ৬ই ফেব্রুয়ারী দিনটি শিল্প এবং সংস্কৃতির দিন হিসাবে পালিত হয়। ইসকন ভক্তরা এই দিনটি পালনের সুযোগ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে ভগবান জগন্নাথদেবের রথযাত্রা পালন করেন। তারা মনোকেয়ারী হিন্দু পরিষদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং ভগবান জগন্নাথের রথ টানা হয়।

TOVP মূলগঠনের কাজ সমাপ্ত, সূক্ষ্ম কাজের শুরু ঃ

মায়াপুর, পশ্চিমবঙ্গ ঃ টেম্পল অব বৈদিক প্লানেটোরিয়াম (TOVP) দল রিপোর্ট করেছে যে, ৫,২০,০০০ বর্গফুটের মূল কাঠামোর কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়াও, প্লাস্টারিং, ইট-গাঁথার কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত। তিনটি চূড়ার ঢালাই এর কাজ এবং ৩৭০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন মুল চূড়াটির কাজও সম্পন্ন হয়েছে। মন্দিরের চতুর্দিকের আটটি সিঁড়ির মার্বেলের কাজও প্রায় সমাপ্তের মুখে। এছাড়াও জলনিরোধক, জলের লাইন এবং বৈদ্যুতিক ব্যাবস্থার কাজ চলছে।

আরও সূক্ষ্ম কাজগুলি ২০১৭ সালের মধ্যে অধিক ভাবে অগ্রগতি হবে। আলঙ্কারিক খিলান যা 'গ্লাস রিইনফোর্সড কংক্রিট' দিয়ে তৈরী তা TOVP-র নিজস্ব সাইট (GCC) কারখানাতে তৈরী হচ্ছে এবং পার্শ্ব চূড়াগুলিতে লাগানো হবে। প্রত্যেকটি খিলান ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া এবং ৯ ফুট ২ ইঞ্চি উঁচু এবং ওজন প্রায় ১,৯৮৪ পাউন্ড। প্রত্যেকটি পার্শ্ব চূড়াতে ১৬টি এবং মূল চূড়াতে এরকম ২৪টি সুদৃশ্য খিলান থাকবে।

নাপেরভেল্লিতে ইসকনের নতুন মন্দিরের সূচনা ঃ

নাপেরভেল্লি, লিনোইস, আমেরিকা ঃ ইসকন নাপেরভেল্লি একটি নতুন কানাই মন্দির নির্মাণের কথা সানন্দে ঘোষণা করেছে। পবিত্র ভূমিপুজনের তিথি নির্ধারিত হয়েছে ২১ মে, ২০১৭। তারপর নতুন নির্মাণ শুরু হবে। প্রথম দফার কাজ জানুয়ারী ২০১৮ মধ্যে সম্পন্ন করার নির্ধারিত সময়।

পুয়ার্তো রিকোতে রথযাত্রা ঃ

পুয়ার্তো রিকো, ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ঃ তৃতীয় বার্ষিক সান জুয়ান রথযাত্রা পেসিও লা প্রিন্সিয়াতে সম্পন্ন হল যা পুরাতন সান জুয়ান প্রদেশের অংশ। 'হারমোনি অব দা সি' যা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় প্রমোদ তরণী তার থেকে প্রায় শতাধিক যাত্রী এসে এই আনন্দঘন রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

উত্তর আমেরিকাতে বৈষ্ণব টাট্টুর পল্লীসংস্কৃতি বৃদ্ধি করেছে ঃ

ভক্ত টাটু শিল্পী বা টাটুকারীরা যারা বহুলভাবে পরিচিত এই বলে যে, তারা রং দিয়ে তাদের ভগবৎ গীতার উপর আধারিত চিন্তাধারাকে অতুল্যভাবে ফুটিয়ে তোলে, তাদেরকে কীর্তনের জন্য একত্রিত করে এমনকি যোগা স্টুডিওতে জপও করে, এবং অধিক থেকে অধিক ভাবে তারা সর্বত্র প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

কানাই নাম দাস (২৯), এদের মধ্যে একনিষ্ঠ দক্ষ টাটু শিল্পী যিনি এলিজাবেথ, নিউজার্সীতে থাকেন। তিনি একজন গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। যখন তাঁর মাত্র দশ বৎসর বয়স তখন তাঁর দিদি তাকে কৃষ্ণভাবনামৃতে নিয়ে আসে।